দ্বিতীয় অধ্যায়
মতুয়া ধর্মের পরিচয়

ঊনবিংশ শতক নবজাগরণের সময়। এই সময়ই ভারতবর্ষে শুরু হয় আধুনিক শিক্ষার প্রচলন, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্যার ও সুযোগ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল হিসাবে প্রথম বাঙালি সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। উনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সমাজ সংস্কার । সমাজের মধ্যে যে ধর্ম ভাবনা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল সেই প্রাচীন প্রবাহিত ধর্ম ধারার মধ্যেই ছিল কুসংস্কারের মারী বীজ নিহিত। একথা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত কয়েক জন মানুষ প্রথম অনুভব করতে পারেন এবং তারা সেই কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ধর্ম সংস্কার করেন। সংস্কারের দ্বারা সমাজে অনেক ধর্মভাবনার প্রকাশ ঘটলেও সমাজের অতি অল্প মানুষই তাতে উপকৃত হন। নব শিক্ষার যে জাগরণ তা হল গ্রন্থনির্ভর জাগরণ বা সহজ ভাবে বলা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে মানুষ; যে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিল তারই একটি দিক। মানুষের উন্নতি হৃদয় বত্তার দ্বারাই একমাত্র অগ্রগামী হয়। এ সত্য সর্ব যুগে সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায়ই সমান ভাবে প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতক নব আলোকের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ ছিল গভীর ভাবে। সমাজের সকল মানুষের জাগরণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই বিভেদ নীতি।

ঊনবিংশ শতকের নব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে, প্রতিয়মান, তাঁরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত। নব আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হলেন—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকান্দ প্রভৃতি মানুষেরা ছিলেন ঊনবিংশ শতকের নক্ষত্র রূপ। কিন্তু এই যে মানুষগুলি প্রত্যেকেই ছিলেন নবজাগরণের মাধ্যম কলকাতাকেন্দ্রিক মানুষ। তাদের চিন্তা চেতনার বিস্তারের সুযোগ ছিল ব্যাপক। অপরদিকে ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের অধিপতি হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন গ্রাম বাংলার মানুষ। আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের সময়ে হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের জাগরণ ঘটালেন তারই অন্বেষণ।

ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলার ঘরে জন্ম নিলেন। পল্লীবাংলার

চিরশোভা 'ছায়া সুনীবিড় শান্তির নীড়' গ্রাম বাংলার পল্লী প্রকৃতিতে। সেই পল্লীবাংলার মায়ের আদরের সন্তান হরিচাঁদ ঠাকুর। জন্মগত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ধর্ম শিক্ষার আদর্শকে। পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণাদেবীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর দ্বিতীয় পুত্র। আর পল্লীগ্রামের তথা সমগ্র দেশে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তা মূলত ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা। ঊনবিংশ শতক থেকে প্রথম আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পল্লীবাংলার বড় কৃষক পরিবারের সন্তানটি ছিল বাল্যকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ও অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। এই হরিচাঁদ ঠাকুরই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মের দ্বারা দিশাহীন মানুষকে তাঁদের চিরায়ত মানবাদর্শকে ফেরত দেন নিজ কর্মবলের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর যে আদর্শ পরিবারের সন্তান ছিলেন তাঁর চরিত্রাদর্শ থেকেই বোঝা যায়। আধুনিক শিক্ষার প্রাক্কালে সমাজের যে নিয়মনীতির প্রচলন ছিল হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সকল নিয়ম প্রথাগুলিকে জানতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর যে জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সেই জাতির নাম হল নমঃ জাতি। এবং সে অঞ্চল ছিল নমঃ জাতির মানুষে পরিপূর্ণ।

মতুয়া ধর্মের আলোচনার পূর্বেই সন্ধান করা প্রয়োজন এই নমঃ জাতির পরিচয় সম্বন্ধে এবং হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকে যে ধর্মভাবনার দ্বারা মানুষকে আত্মশক্তি দান করেন সে ধর্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনায় কেমন ছিল তারই সন্ধান করবো; বিভিন্ন গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ আজও যে প্রগতিশীল ভাবে মানব সমাজে অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই সন্ধান করবো।

প্রাক্-আর্য জাতি পরিচয় ও সংস্কৃতির সন্ধান :

প্রাক্-আর্য ভারতের জাতির পরিচয় গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হলেও অনেক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাক্ আর্য ভারতের জাতি পরিচয়, ধর্মভাবনা, সংস্কৃতির পরিচয় সামগ্রিক ভাবে না পেলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙালি জাতি যে একটি মিশ্র সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত তা সকলেই স্বীকার করেন। আজকের এই আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের ভূমিকায় আর্য পূর্ব যুগের মানুষের অবদানই বেশি সে কথা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানব। আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে তিনটি অনার্য জাতি বা মূল ভারতীয় জাতির বাস ছিল। 1. Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবাটু শ্রেণীর অনার্য। 2. Austric

অস্ট্রিক জাতি ও দ্রাবিড় জাতি। ভারত সভ্যতার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে সুসভ্য বাঙালি জাতির পরিচয় আমরা পাই সেই সংস্কৃতির মূল উপাদান ধর্ম উপাসনা। সেই ধর্ম উপাসনার বড় বড় দেবতাগুলি প্রাক্-আর্য ভারতেই বর্তমান ছিল। আজ বৃহৎ ভারতে যে হিন্দু ঐতিহ্যের জন্য এত গর্ব বোধ করে থাকেন গোঁড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ তাও অনার্য সংস্কৃতির দান। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন হিন্দু সভ্যতার মূল ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। তিনি আলোচনায় যা বলেছেন তাকে উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে আজকের হিন্দু সভ্যতা মার্জিত অনার্য সভ্যতারই বিবর্তিত রূপ। শুধুমাত্র গঠন বৈচিত্রটিরই পরিবর্তন ঘটেছে। মূলত দেশীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলেছে। দ্রাবিড় জাতির পরিচয় বর্ণনা করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন তা হল—

> ''আর্য্যেরা ভারতে আসবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল বলে অনুমান হয়। পশ্চিম ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল; তবে অনুমান হয়, এরা উত্তর ভারতে আর পূর্ব ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে মিলে একত্রে বাস করত। অস্ট্রিক (কোল) আর দ্রাবিড়, অই দুই জাতির খুব মিলন আর মিশ্রণও ঘটেছিল বলে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল; বড়ো বড়ো বাড়িঘর নগর প্রভৃতি বানাত, — হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিড়দেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীকল্পনা ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ সাধনার মূলতত্ত্ব ও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় বলে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার বিরাট সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে বোধ হয়।''[১]

আর্য্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল, তখন দেশে সুসভ্য দুটি বড়ো অনার্য জাতি বাস করত। আর আজকের এই যে উন্নত নাগরিক সভ্যতা তা মূলত দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রথম

প্রচলিত ছিল। আর অস্ট্রিক সভ্যতা ছিল মূলত গ্রামীণ সভ্যতার পরিচায়ক। নবাগত আর্য্যদের সভ্যতা ছিল মুখ্যত যাযাবরও অংশ গ্রামীণ সভ্যতা। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং নবাগত আর্য্য এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও রক্তের সংমিশন ঘটলে নবভাবের জন্ম হয় ধীরে ধীরে। এই সংমিশ্রণ ও পাশাপাশি বসবাসের ফলে প্রথমে যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক দিনের ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে স্থান পেল দুই সংস্কৃতির মানুষের জীবনের ধর্মকর্ম ও তত্ত্বদর্শন ও ভাবের। এর ফলে দেখা যায় অনার্য্য বা মূল ভারতীয় যে সংস্কৃতি, অনার্য্যের দেবতা, অনার্য্যের ধর্মানুষ্ঠান, অনার্য্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনার্য্যের ভক্তিবাদ, আর্য্যদের বিশেষ উপসনা রীতি 'হোম' এর জায়গায় বা সহাবস্থানে স্থান করে নেয়। এবং এদেশীয় রাজা বা অনার্য্য রাজাগণ ও আর্য্যদের ভ্রাতৃ ভাবে গ্রহণ করতে থাকে। ফলে আর্য্যদের ভাষা যা সংস্কৃত ভাষা বা দেবনাগরী হরফ ও বঙ্গীয় অনার্য্য ভাষা বা আদিতম যে ভাষায় মূল ভারতীয়গণ কথা বলত সেই ভাষার ও সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে গড়ে ওঠে মিশ্র আর্য্যানার্য্য সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, এই মিশ্রণ ঘটে আর্য আগমনের পর। এই যে তথাকথিত হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় National বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠতে আনুমানিক হাজার বছরের মত সময় লাগে। অর্থাৎ খ্রিস্ট-পূর্ব-১৫০০ -র পরে। বুদ্ধদেবের সময়কাল খ্রিস্ট-পূর্ব, ৫০০ দিকে—হিন্দু সভ্যতার কাঠামো তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একথাও জোর দিয়ে বলা যায় যে মূল ভারতীয়দেরই ছিল লীলাকথা, প্রাচীন রাজা রাজরাদের কাহিনি। সম্প্রতি অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে অনেক নতুন তথ্যের যা অনেককাল ধরে ছিল গোপনে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে—

> ''ক্ষত্রিয়েরা মুখ্যতঃ অনার্য্য রাজন্য সম্প্রদায়ের লোক; দেশে
> আবহমান কাল থেকে যে অনার্য্য রাজারা রাজত্ব করতেন,
> নবগঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখে
> তাঁরাই ক্ষত্রিয় রূপে গৃহীত হলেন।''[২]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও প্রাক্-আর্য্য পর্বের সন্ধান দিলেন এভাবে—

> ''১৯২০ সালে যখন পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলেন, এবং তাহার পরে যখন দক্ষিণ পাঞ্জাবের হড়প্পায় ও সিন্ধুপ্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ও অন্যত্র এক বিরাট নাগরিক সভ্যতার বহু নিদর্শন বাহির হইতে লাগিল, তখন বিশেষজ্ঞগণ এই সভ্যতাকে বেদ বর্ণিত জগৎ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক দেখিয়া ভারতের আর্য্য-পূর্ব যুগের জাতিদের সঙ্গে ইহার সংযোগ অনুমান করিতে লাগিলেন।..... সুতরাং ভারতের যে আর্য্য পূর্ব জাতি মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমের অধিবাসী জাতিদের যোগ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হইল।''[৩]

ভারতের আদি জাতির মানব গোষ্ঠী কারা এ প্রশ্নের ও উত্তর দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন—

''নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া মনে হয় যে, আদিম দ্রাবিড় জাতি-ই ভারতের সুপ্রাচীন যুগের আর্য্যদের আসিবার পূর্বের কালের এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল; 'স্রষ্টা' জোর করিয়া বলিতে না পারি-তাহাদের মধ্যেই এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, একথা বলিতে পারি।''[৪]

দ্রাবিড় জাতি যে আর্য্য পূর্ব ভারতে একটি সমৃদ্ধিমান জাতি ছিল একথা সর্বজন স্বীকৃত। আর্য্য পূর্ব ভারতে যে প্রাচীন অধিবাসীরা বাস করত তাদের নিজস্ব ভাষাও ছিল। আর প্রাচীন ভারতবাসীর ভাষা হারিয়ে যাওয়ার নয়। বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার পরিবর্তন বা বিবর্তনের মধ্য দিয়েও সেই মূল ভারতবাসীদের ভাষার সন্ধান করলে দেখা যায় মিশ্র ভাষায় ও আদি ভারতীয় ভাষা তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও ড. অতুল সুর আমাদের প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনার্য্য ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—

''আর্য্যদের প্রথম আগমণের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড় কোল প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা বল্‌ত তাতে কোন সন্দেহ

নেই। আর্য্যদের আসবার বহু শত বৎসর পর পর্য্যন্তও এই সব অনার্য্য ভাষা জীবন্ত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ে, এমনকি তার ৫০০/৬০০ বৎসর পরেও—উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি জুড়ে জন সাধারণ অনার্য্য ভাষা বলত, ...। এইসব অনার্য্য ভাষীদের দ্বারা আর্য্য ভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার-অনুষ্ঠানও আর্য্যীকৃত হয়ে গেল, সেগুলি সর্বজন-গৃহীত হয়ে পড়ল- পৌরাণিক দেববাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল- বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল' অনার্য্যদের বড়ো বড়ো দেবতা-শিব, উমা, বিষ্ণু-অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন, তাদের আরও মহনীয় করে তুললেন। অনার্য্যদের বৃক্ষদেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ নাগ, আর দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতারূপে কল্পিত নানা পশুপক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে পূজা এসবও এসে গেল।''[৫]

আর্য্য ও অনার্য্য জাতির যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠল তাদের ভাষায়ও এল মিশ্রণ। এই মিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হল সে ভাষা হল সংস্কৃত ভাষা। সেই মিশ্র ভাষার মূলেও রয়েছে অনেক দ্রাবিড় শব্দ। Kittel-এর (কিটেল) বিখ্যাত কানাড়ী অভিধানের ভূমিকায় ৪৫০টি শব্দের আলোচনা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার অনেক উপাদান যা মূলত বেদ বিরোধী ও বৈদিক জগতের বহির্ভূত তা এই ভারতীয় মূল আদিবাসী দ্রাবিড় সভ্যতার থেকে গৃহীত হয়েছে।

আলোচনার মাধ্যমে দেখব 'হিন্দু সভ্যতার গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান' সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন ড. অতুল সুর মহাশয়। ড. সুরের আলোচনার কিছু অংশকে তুলে ধরলাম ভারত সংস্কৃতির প্রাথমিক রূপের পরিচয় গ্রহণের জন্য। ড. অতুল সুর নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

''সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার যে সকল লক্ষণ, তার সবই আমরা সিন্ধু সভ্যতার নগর সমূহে লক্ষ করি। পেনসিলভেনিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল বলেন যে চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি। নগরগুলির রাস্তাঘাট বেশ সুপরিকল্পিত ছিল। ঘরবাড়ি দগ্ধ-অদগ্ধ ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত হত। নগরের মধ্যে ছিল সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার বিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, দেবালয় ও সমাধিস্থান। এক কথায় সংবদ্ধভাবে নাগরিক জীবন যাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসন ব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহ সামগ্রী নির্মাণে তামা ও ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহনের জন্য চক্র বিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার রূপ দানের জন্য লিখন প্রণালীর ও ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার মানে সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। নগরগুলির নির্মাণ রীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে, বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কিত কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ অনুযায়ীই নগরগুলি নির্মিত হত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের যে পাটি গণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষ রকম জ্ঞান ছিল তার বহুল নিদর্শন আমরা পেয়েছি। ধাতু বিদ্যাতেও তাদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।''[৬]

আজকের মিশ্র বাঙালি বাংলাদেশের বাসিন্দা বাঙালি সংস্কৃতির গঠন একদিনে হয়নি। আর হিন্দু সভ্যতার মূলে যে প্রাগার্য সভ্যতার অবদান অনেক বেশি একথা অনস্বীকার্য। আর একটি ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান দ্বারা একথা প্রমাণ করবো আর্য সভ্যতা নবাবিস্কৃত পৌরাণিক সভ্যতার স্রষ্টা নন। তার পরিচয় গ্রহণ করবো। ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থ থেকে। বৈদিক সভ্যতার থেকে পৃথক এই সিন্ধু সভ্যতা একথার পাশাপাশি এও জানাচ্ছেন এদেশীয় আদিবাসী বা অনার্য্যদের জীবন ধারাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়। ড. অতুল সুর মহাশয়ের বর্ণনাই তুলে ধরলাম আলোচনায় সুবিধার জন্য। অনেকেই মনে

করেন যে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক আর্য সভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু এটা ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুই সভ্যতার মৌলিক পার্থক্যগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায়। দুই সভ্যতার মূলগত পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হল—

'' ১. সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন উপাসক ছিল ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না শিশ্ন উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। আর্যরা পুরুষ দেবতার উপাসক ছিল। মাতৃকা দেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা ঋগ্বেদে পাই না।

২. আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল। ঘোড়াই ছিল তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু। এখানে বলা দরকার যে, ঘোড়ার কোন অশ্মীভূত অস্থি আমরা সিন্ধু সভ্যতার কোন কেন্দ্রে পাই নি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দের প্রতিকৃতি ক্ষোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব আরাধনার প্রমাণও মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীর্বদ শিবেরই বাহন। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়।

৩. সিন্ধু সভ্যতার বাহকেরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সে জন্য তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম পুরন্দর রেখেছিল।

৪. আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত।

৫. আর্যদের মধ্যে লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন-প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।

৬. সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু পাঞ্চাল দেশ অর্থাৎ যেখানে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্য মূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্র সমূহ থেকে যে সব মৃৎ

পাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলির রঙ 'কালো লাল'।

৭. সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষি ভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষি কার্য জানত না। এটা আমরা শত পথ ব্রাহ্মণের এক উক্তি থেকে জানতে পারি।

৮. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নূতন জীব বিশেষ ছিল। এজন্য তারা হাতিকে 'হস্ত বিশিষ্ট মৃগ' বলে অভিহিত করত। বস্তুত হাতিকে প্রাচ্য ভারতের পালকাপ্য নামে এক মুনিই প্রথম পোষ মানিয়ে ছিল।''[৭]

অনার্যদের দেশে আর্যদের আগমন হলে স্বাভাবিক কারণেই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পর সংস্কৃতির সমন্বয় একসময় হয়। আর এই সভ্যতার সংস্কৃতির মানুষের সে সময় কীভাবে তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে মিলন ঘটেছিল সে সম্পর্কে ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে যা বলেছেন তাতে দুই সংস্কৃতির মধ্যে কোন সংস্কৃতির প্রাধান্য বজায় থাকল তার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্তিগুলির কিছু অংশ গ্রহণ করলাম—

''আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা 'কুরু-পঞ্চাল' দেশ বলতাম যা গঙ্গা ও যমুনার অন্তবর্তী অঞ্চল। সেখানে আর্যদের আপস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতিগান করে না। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে না। নূতন দেবতা মণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার

চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সমূহেরই জয় হল। বেদ সংকলন ও মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি রচনার ভার ন্যস্ত হল এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের উপর।''[৮]

আজকের ধন ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার প্রচলন তাও হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকেই উদ্ভূত একথা জানা যায়। বাঙলাই মাতৃদেবীর পূজার লীলাকেন্দ্র। ধান্যের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী পূজার অপর নাম খন্দ পূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফসলাদি। আবার লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। 'শ্রী' প্রাচীন ভারতের এক লোকায়ত দেবী ছিলেন। আর হিন্দুদের অপর দেবতা শিব ও শক্তি যে কেবলমাত্র নরাকারে পূজিত হতেন তা নয় লিঙ্গ ও যোনি হিসাবেও পূজিত হতেন। আর সেটার উল্লেখ পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরা যে লিঙ্গ যোনি উপাসক ছিলেন তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রতীক সমূহ থেকে। এছাড়াও প্রাগার্য সূর্য পূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। ছট পূজা, ইতু পূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ। এই যে প্রাগার্য দেবতা বা শক্তির উপাসনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে দেবতাদের রূপের পরিবর্তন ঘটে নি; কিন্তু দেবতাদের প্রকাশের ভিন্নতার রূপটি ধরা পড়ে। একটি বিষয় আলোচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে মূলত একটি ভাবধারাই প্রকাশিত সেটা রচনা বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যায়, যেমন—ভগবদগীতা ও ব্যাসের রচনা এবং ব্যাস পুরাণগুলির রচয়িতা। আমার গবেষণা গ্রন্থের আলোচনার পূর্বে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করব।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ :

ধর্ম সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সাধারণত তাতে প্রথমেই যে নামগুলো উঠে আসে তা হল রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ সাহিত্যগুলির কথা। এরপর ধর্ম সাহিত্যগুলির মধ্যে পড়ে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য সম্ভার। আর ধর্ম সাহিত্য বলতে আর একটি কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকে। এর আগের যা কিছু সাহিত্য রয়েছে তা দেবদেবীরই কাহিনি। মানুষের উপস্থিতি ভক্তরূপে মানব কুলে জন্মে মানুষের জীবনাচারণের কাহিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করত। আর এই যে ধর্ম সাহিত্য সম্ভার তাতে যতই ভগবান বা ঈশ্বর কথা থাক না কেন এখানে মানুষ ও গৌণভাবে স্থান পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকে এল নবজাগরণ ফলে ধর্ম সাহিত্যগুলি বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা আবার বিশ্লেষিত হতে থাকল পণ্ডিতদের কাছে। নবজাগরণের মাধ্যমে প্রথম মানুষ ধর্ম সাহিত্য থেকে মানুষের বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করতে অগ্রসর হলেন। ইতিহাস পুরাণ শ্রেণির রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। এ দুটি আমাদের ঐতিহ্য সমর্থিত জাতীয় মহাকাব্য। মহাকাব্য দ্বয়ের মধ্যে রামায়ণই প্রাচীনতর। রামায়ণ কাহিনির মূল কাহিনির যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে সেটাই তুলে ধরলাম—

> ''ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে তো বটেই রামকথার মধ্যেও রূপ কথার কাঠামো অথবা প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করা যায়। সুয়োরাণীর বশীভূত রাজা যে সে রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিবেন দুয়ো (বড়) রাণীর ছেলের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া-এ তো রূপকথার অত্যন্ত সাধারণ মোটিফ। বনে গিয়া নানারকম দুঃখভোগ ও শেষে দেশে আসিয়া রাজ্য লাভ ইহাও তাহাই।.....। যাহাই হউক বাল্মীকি তাঁহার সংগৃহীত ও উদ্ভাবিত উপাদানকে একটি সুসঙ্গ ত সুগঠিত মহাকাব্য আখ্যানে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব কারিগরির একটি প্রধান বাহাদুরি ছিল ভূমিকাগুলির নামের মধ্যে রূপক প্রতীকের ব্যবহার। রাম-লক্ষণ-সীতা-রাবণ এই চারিটিই বাল্মীকি অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চরিত্র। 'রাম' নামের অর্থ বিরত শান্তি ও শান্ত অবস্থিতি। রাম বরাবর সেই কাজই করিয়াছেন। তিনি পিতৃসত্য মানিয়া বনে গিয়া পিতার সংসারে শান্তি দিয়াছিলেন, যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষস বিনাশ করিয়া বনবাসী মুনিদের শান্তি দিয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়া মিত্রকে শান্তি দিয়াছিলেন, রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের দ্বারা আপনার চিত্তকে শান্ত

করিয়াছিলেন, এবং উত্তরকাণ্ডকে ধরিলে, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রজাদের শান্ত করিয়া ছিলেন। 'সীতা' নামের মূল অর্থ চাষা জমিতে লাঙ্গলের রেখা। কৃষি সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে সীতা বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে শ্রীসমৃদ্ধির প্রতীক রূঢ় হইয়া দেবতায় উন্নীত হইতে চলিয়া ছিলেন। কৃষিলক্ষ্মী শান্তির অনুগামিনী। তা 'সমগ্রা রূপিনী লক্ষ্মী' সীতা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'লক্ষ্মণ' নামের মানে শুভচিহ্নকারী। লক্ষ্মণ-লক্ষ্মী-শ্রীর পুরুষ রূপ। তাই তিনি শান্তির সহচর। 'রাবণ' নামের বুৎপত্তিগত অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধ বাহিনী।.....। বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইবার পরে দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যখানি উচ্চ সাহিত্যের মঞ্চেই স্থাপিত ছিল। জনসাধারণে যে রাম কথা জানিত তাহা লৌকিক আখ্যায়িকা, নীতি কথা অথবা রূপকতা রূপেই। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া, গৃহীত হইয়া পূজা পাইবার পরেই তবে রামায়ণ জন পদ সাহিত্যের ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছিল। বাল্মীকির কাব্যের নায়ক দেবকল্প নহেন, তিনি সুকৃতকর্মা বীর, তাই তিনি আসল অর্থে নারায়ণ।''[৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় রামায়ণের মূল কাহিনিটি ছিল লোক গাঁথা। পরে আদি কবি বাল্মীকির দ্বারা গ্রন্থবদ্ধ হয়ে মহাকাব্য আকার ধারণ করেছে। আর বাঙালি রামায়ণের লেখক তথা অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝাঁ। আর মহাভারতের বাঙালি অনুবাদক কাশীরাম দাস। এ দু'জনকেই শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের মর্যাদা দেওয়া হয়। যাদের জন্য 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বাঙালির ঘরের কথায় পরিণত হয়েছে।

'মহাভারত' সংহিতা অনেক রচনার সংকলন। সংকলিত রচনাগুলি প্রায় সবই নারাশংসী গাঁথা বা আখ্যায়িকা। মহাভারতের মেরুদণ্ড হল বিরাট নারাশংসী গাঁথা তার বিষয় কৌরব ও পাণ্ডব দলের বিরোধ। আখ্যান-আখ্যায়িকা কাব্য-গাঁথা, গাঁথা-স্তব নীতি কথা সাধারণজ্ঞান যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি ধর্মচিন্তা আধ্যাত্মভাবনা-সবকিছুই এখানে উপস্থিত। বিচিত্র রকমের সাহিত্যরস মহাভারতের মধ্যে যেমন আছে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোন

একটি আধারে তেমন নেই। এই বৃহৎ ভারতের নানা কাহিনি উপকাহিনি কোন একটি নিদৃষ্ট কালের রচনা নয়। বহু কালের বহু মানুষের সংকলিত কাহিনির সংযোজন এই বৃহৎ মহাভারত। মহাভারত সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যা বলেছেন তা হল—

> ''মহাভারত কোন ব্যক্তির রচনা নয়। বহু ব্যক্তির বহু কালের বহু রচনা বহু গায়কের কণ্ঠে বহু লেখনীর সংশোধন পাইয়া তবে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রচনার ও সংশোধনের কাজে যাঁহাদের হাত ছিল তাঁহারা যে সবাই বড় কবি অথবা ভালো কবি ছিলেন তা নয়। মহাভারতের আখ্যায়িকা রচনার কালে ছোট কবিও নিজের অজানিতে বড় কবির উদ্যম প্রকাশ করিয়া ছিলেন। এ রচনায় ভদ্র সাহিত্যের বাছ বিচার ছিল না, অলংকার শাস্ত্রের শাসন মানিবার কোন দায়িত্ব ছিল না, পাণিনীয়-ব্যাকরণের বেড়ি ছিল না। তাঁহারা কল্পনাকে নিজের মনোমত পথে ছাড়িয়া দিতেন। এই স্বাধীনতার জন্য মহাভারতের মধ্যে সজীব সাহিত্যের রঙ ও রস মাঝে মাঝে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া যায়।''[১০]

আমাদের ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক জাতীয় কাব্য গ্রন্থটি যে সংকলন গ্রন্থ সে বিষয়ে ড. সুকুমার সেন নিশ্চিতভাবেই বলেছেন—''মহাভারতের কাহিনী জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে বৈশম্পায়ণ কর্তৃক গীত হইয়াছিল। কিন্তু আখ্যান-আখ্যায়িকাগুলি বিভিন্ন মুনি-ঋষির উক্তি বলিয়া লেখা আছে। মহাভারত যে সংকলনগ্রন্থ তাহা ইহা হইতেও উপলব্ধি হয়।''[১১] রামায়ণ, মহাভারত যে বাঙালির নিজের ঘরের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মচিন্তার ঘণীভূত নির্যাস যাতে প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'গীতা'। উচ্চ গ্রামের আধ্যাত্মবাণী যে কবিত্বের বাঁশিতেই বাজে তার এক বড় নিদর্শন হল গীতার মূল বিষয়বস্তু। উপনিষদের ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের পরে ভারতীয় আধ্যাত্ম চিন্তায় ভক্তিযোগের সঞ্চার হয়েছিল। গীতায় ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধনের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং ব্যক্তি ঈশ্বরত্বের সমুন্নীত অবতার বাদের প্রতিফলন রয়েছে গীতায়।

সুকুমার সেন গীতা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তা যেমন মননশীল চিন্তার পরিচায়ক তেমনি তার তাৎপর্য। গীতা সম্পর্কিত আলোচনা যথার্থভাবেই তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''গীতার পটভূমিকা বেশ নাটকীয় গোছের। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়া প্রতি পক্ষদের দেখিয়া অর্জুনের মন আর্দ্র হইল। ভাবিল, 'এই সবই আমার প্রিয় আত্মীয়-বান্ধব, যাহাদের যত্নেও স্নেহে মানুষ হইয়াছি, যাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছি। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তখন কৃষ্ণ তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিলেন তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরই উপযুক্ত।
>
> সদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎসে ইতি মন্যসে।
> মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।
>
> 'আমিত্বের উপর ভর করিয়া তুমি যে বলিতেছ 'যুদ্ধ করিব না'।
> তোমার এ স কল্প বৃথাই। তোমার স্বভাব তোমাকে যুদ্ধ করাইবে।'
>
> সবদেশের সকল অবস্থার সব মানুষের জন্য গীতায় যে অভয় বাণী আছে তাহার তুল্য আর কোথাও আছে কিনা জানি না।''[১২]

এই অভয়বাণী সত্ত্বেও মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হয়। সাহিত্যগুলির সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষার ফলে জ্ঞানের বিকাশ যথার্থভাবে হয় না সর্ব জায়গার মানুষের জ্ঞানের আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না ফলে সকলে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় না। প্রয়োজন হয় মহামানবের।

প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে যেগুলির নাম উঠে আসে তা হল 'পুরাণ'। পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতাও অসুরের। ড. সুকুমার সেন পুরাণ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল—

> ''পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতাও অসুর, কখনও কখনও দেবকল্প ও অসুরকল্প মানুষ লইয়া। পুরাণের মানুষকে ইতিহাসে ধরা যায় না, বাস্তবে তো নয়ই। সে সম্পূর্ণ ভাবে মিথলজির। ইতিহাসের তুলনায় পুরাণে দেবতার অবতারের ক্ষেত্র অনেক

প্রশস্ত। 'পুরাণ' নাম দেওয়া গ্রন্থগুলি বিভিন্ন কালে রচিত ও সংকলিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম পুরাণের সংকলন কাল ৪০০ খ্রিস্টাব্দের আগে যাইবে না। অর্বাচিনতম পুরাণ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। পুরাণগুলিতে বিবিধ দেবতার মাহাত্ম্য স্থাপিত হইলেও বিষ্ণুই সমস্ত পুরাণের অধিদেবতা।''[১৩]

ইতিহাসও পুরাণ সাহিত্যে আঠারো এই সংখ্যাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেননা ইতিহাস পুরাণ রচয়িতাগণ এই সংখ্যার ব্যবহার করেছেন অনেক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। যেমন মহাভারতের পর্ব সংখ্যা ১৮, গীতার অধ্যায় সংখ্যাও আঠারো, পুরাণের সংখ্যাও আঠারো। আরও একটি সত্য প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক যে ব্যাসদেবের নামে চলে এই পৌরাণিক জ্ঞানভাণ্ডার সম্বলিত গ্রন্থগুলি। পুরাণের রচনার মূল উপাদান আবার গীতার— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের প্রভাব রয়েছে এবং এই ত্রিগুণের দেবতাগণ হলেন—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব। এই তিন শক্তির প্রতীক এই তিন দেবতার আঠারোটি পুরাণ রচিত হয়েছে মূলত। কিন্তু পুরাণ কাহিনির যে, অন্ত নেই সেই রূপ আরো অনেক উপ-পুরাণ রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময় ধরে। এই কাল্পনিক পৌরাণিক কাহিনির প্রভাবে সমাজের ভক্তিবাদের বিস্তৃত আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এও আমরা দেখব যে ধর্ম সংস্কার করা কত কঠিন। যুক্তি মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কীভাবে প্রথমে মানুষের মনকে বাস্তব জগতের কর্মবাদের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জাতি পরিচয় ও নমঃজাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান :

হরিচাঁদ ঠাকুর জাতিগত পরিচয়ে নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান। হরিচাঁদ ঠাকুর যে জাতির সন্তান এবং যে ভাবধারার দ্বারা বড় হয়েছিলেন তা হল বৈষ্ণবীয় ভাবধারা। কিন্তু জাতিগত পরিচয়টি একটি সমাজ জীবনের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করলেও তাঁর পরিচয় হয় স্বকর্মের দ্বারা। আমার আলোচ্য হরিচাঁদ ঠাকুর কর্মের দ্বারা অতি অল্প বয়সেই ভগবান হিসাবে পূজিত হয়েছেন। কর্মের দ্বারা ভগবানের মর্যাদা পেলেও আজ একথা সর্ব প্রথমেই আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে; এই নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধানের। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন—

''নমঃশূদ্র কুলে এল ব্রহ্মসনাতন।''[১৪]

নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান :

কোন জাতির অতীত ইতিহাস সন্ধান করতে হলে যে কথাটি সর্ব প্রথমেই প্রয়োজন হয় তা হল জাতির ইতিহাসের। জাতির ইতিহাস লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকল জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং কোন জাতির উত্থান পতনের সঠিক ইতিহাসই পারে জাতিকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আমার আলোচ্য হরিচাঁদ ঠাকুর যে নমঃ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই নমঃ জাতির সঠিক ইতিহাস সন্ধান করার। এই নমঃ জাতির কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলে একটি বৃহৎ মানব গোষ্ঠির জাতীয় জীবন সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। হরিচাঁদ ঠাকুর যে নমঃ পরিবারে জন্মে ছিলেন। তাঁদের গোত্র ধরে তথ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হলাম।

জাতিগত পরিচয়ে কাশ্যপ মুনির বংশধর নমঃ জাতি। কাশ্যপ মুনির বংশধর নমঃ জাতির ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া দরকার তা হলো ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বংশ বা গোত্র সৃষ্টির ইতিহাস। এই গোত্র সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতিগত পরিচয়ের অনালোকিত ইতিহাস। নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস রচনা করেছেন মনিমোহন বৈরাগী। তাঁর নমঃ জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'অনালোকিত ইতিহাসের উত্থান-পতনে কাশ্যপ মুনির বংশধর 'নমঃ জাতি'।' তিনি নমঃ জাতির ইতিহাস সন্ধান করেছেন গোত্র ধরে। মনিমোহন বৈরাগী নমঃ জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল—

> ''কোন এক সময় প্রাচীন ভারতীয়রা ছিল উপজাতীয় ভিত্তিতে বিভক্ত। যদিও উপজাতি এখন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তথাপি উপজাতীয় অবস্থান এখনও বিদ্যমান। যেমন— নমঃ উপজাতিটি এখন নমঃ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও তা আসলে নমঃদের সেই উপজাতীয় অবস্থানই বটে। প্রতিটি উপজাতির মানুষেরা ছিল ছোট ছোট অসংখ্য পরিবারে বিভক্ত। সমস্ত পরিবারের উপাস্য বিষয় একই রকম ছিল না। সজীব বা নির্জীব উপাস্যের

ভিত্তিতে একই উপজাতির মানুষেরা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। তাই একই ধরণের উপাস্যেরা মিলিত ভাবে অসবর্ণ বিবাহে সম্মতি সূচক এক একটি দল গঠন করে। যাকে বলা হয় গোত্র বা কূল। ফলশ্রুতিতে একই উপজাতির মানুষেরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত হয়। এই সমস্ত গোত্রের আবার নামকরণ হয় উপাস্যরা যে ব্যক্তির ভাবনা অনুযায়ী দলবদ্ধ হয় ঐ ব্যক্তির নামানুসারে। যা মূলত কোন জাতি নয়, একটি পরিবার। যেমন, কাশ্যপ মুনির ভাবনা অনুযায়ী দলবদ্ধরা পরিচিত হয় 'কাশ্যপগোত্র' নামে। এভাবেই নিষিদ্ধ হয় একই গোত্রের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন। কারণ তারা মনে করতেন, তারা একই পূর্ব পুরুষের বংশধর। তাদের ধর্মনীততে একই রক্ত প্রবাহিত।''[১৫]

বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে নমঃজাতির লোকেরা মূলত কাশ্যপ গোত্রের লোক বলেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নমঃরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত ছিল। রিজলির মতে—নমঃ জাতির মানুষ চারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। যেমন—১. কাশ্যপ, ২. ভরদ্বাজ, ৩. লোমশ এবং ৪. শাণ্ডিল্য। রিজলি সাহেবের এই গবেষণা মূলক বিবৃতিটি নমঃজাতির ইতিহাস জানার জন্য এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যেহেতু এই গোত্রগুলি এখন ব্রাহ্মণ সহ অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায়। নমঃজাতির ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। ড. অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে বাংলার জাতি বিভাজনের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা নমঃজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ড. সুরের মন্তব্যটি হল—

''...কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পাল রাজাগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যুগে জাতিভেদের যে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। পাল রাজগণের পরে সেন রাজগণ বাঙলায় আবার ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নূতন করে আবার একটা জাতি বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু পাল রাজগণের

চারশত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহু সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' (যা সেন রাজগণের রাজত্ব কালের অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল) থেকে জানতে পারি যে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার আর সব জাতিই সংকর জাতি।''[১৬]

'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' একটি উপ-পুরাণ, এই উপ-পুরাণটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক। তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়ে সমসাময়িক বাংলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত এ বিভক্ত ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা 'ব্রাহ্মণেতর শূদ্রবর্ণের লোকগুলিকে বর্ণ বিভাগ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। আর এই সময় থেকেই নমঃজাতিটি বর্ণবিজাজনের মধ্যে পড়ে বর্ণ ধর্মের স্তরের অধিকারী হয়।

অধ্যাপক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের 'বাঙলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব' আলোচনার সময় নমঃজাতির পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়ে অন্য সকলকে জাতিগত বর্ণ বিভাজন করেছেন এ সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

''ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সাংকর্যের কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ হয়তো এই যে, এই সব পুরাণ ও স্মৃতি প্রায়শ তাঁহাদেরই রচনা; অথচ নরতত্ত্বের দিক হইতে দেখা যাইবে এই জাতি সাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও। নরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই কথাটা ভাল করিয়া ধরা পড়িবে এবং দেখা যাইবে; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পরিবাণে সংকর, বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তম এবং মধ্যম সংকর বিভাগের অধিকাংশ বর্ণই সেই পরিমাণে এবং প্রায় একই বৈশিষ্ট্য সংকর।''[১৭]

আমার আলোচনার সুবিধার্থে শুধুমাত্র নমঃশূদ্রদের নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ

করলাম। কেননা সময় ও প্রবন্ধ বিস্তার জনিত কারণে অন্য জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করলাম না। যথা সময়ে অর্থাৎ গুরুচাঁদ ঠাকুর ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ভাবনায় সমগ্র জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করব বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে। নমঃশূদ্রদের যে অসংখ্য জনসাধারণ বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ জাতি তাদের দেহ গঠনের পরিমিতি যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে হাটন ও রিজলির নাম করতেই হয়। এরা সকলে নমঃশূদ্রদের বিশ্লেষণ করে যা পেয়েছেন সেই তথ্যই পরিবেশন করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় সেই সম্পর্কে বলেছেন তা হল নিম্নরূপ—

> ''ইহাদের সকলের সম্মিলিত বিশ্লেষণ হইতে দেহগঠন, চোখ ও চামড়ার রং, কেশ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সহজেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো ইহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত; ইহাদের চোখ ও চামড়ার রঙও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই মতো, অথচ স্মৃতি শাসিত হিন্দু সমাজে ইহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতি গণনার মধ্যে তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়ত পাওয়া যাইবে জাত সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।''[১৮]

এই বৈশিষ্ট্য এগুলি ছাড়াও কয়েকটি জাতির লোকদের সম্বন্ধে এবং উক্ত বৃহদ্ধর্ম পুরাণের সকল জাতিগুলির সম্বন্ধেও অতিরিক্ত কিছু কিছু পরিমিতি গণনা বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদেরা করেছেন, সেখানেও উচ্চবর্ণ লোকদের সম পর্যায় ভক্ত নমঃশূদ্ররা। ড. নীহাররঞ্জন রায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

> ''...উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বর্ণের বাঙালীর দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে মধ্যমাকৃতি; নমঃশূদ্ররাও তাহাই।

.....।

মুণ্ডাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং নমঃশূদ্ররা যেমন গোলাকৃতি, উত্তম সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই।

.....।

নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নমঃশূদ্র বর্ণের লোকেরা সকলেই সাধারণত তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসা।''[১৯]

'ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালীর স্থান' বিষয়ক আলোচনার মধ্যেও দেখা যায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তার পরিচয়। নমঃশূদ্রকেও চণ্ডাল জাতিকে অনেক ঐতিহাসিক সমপর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করলেও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি ঠিক তার পরিচয় দেয় না। এমনকি নমঃজাতির মধ্যে যে সমাজ সংস্কার মূলক ক্রিয়া কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাতেও তারা ব্রাহ্মণ সমগোত্রীয় পর্যায়ে পড়ে। যেমন—পূজায় অন্নভোগ অধিকার, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেও দশ দিন পালন করা হয়, বিবাহ ও সেই একই পর্যায় ভুক্ত এ থেকেও বোঝা যায় তারা ক্রিয়াকর্মেও উচ্চবর্ণের সমগোত্রীয়। সেকথাই বার বার ব্যক্ত করেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়; যে উচ্চবর্ণের নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবিভাজিত সমাজের তাঁদের স্থানের যথার্থ পরিচয় অনুসন্ধানের বিষয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় যে প্রশ্নের উত্তর পান নি সেই অনালোকিত অতীত ইতিহাস রয়েছে নমঃজাতির। সেই অতীত ইতিহাসের সন্ধান করার আগে রায় মহাশয়ের উক্তিটিকে গ্রহণ করলাম আলোচনার সুবিধার্থে—

''নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর।....., দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর ভারতের বর্ণ ব্রহ্মণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত উত্তর ভারতের বর্ণ বাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ- বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ এই নমঃশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। আমরা বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের

সঙ্গে নরতত্ত্ব প্রমাণগত তথ্যের যুক্তিরও ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যার

কোন সম্বন্ধ এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।''[২০]

বাংলায় পাল রাজাগণের পরাজয়ের পর সেন রাজত্ব কালে নবভাবে ধর্মসংস্কার হয়। আর সেই পূর্বের পরাজিত পাল রাজাগণের বংশধরগণকে যখন ধর্ম পরিবর্তনের আদেশ দেন সেন বংশীয় রাজাবল্লাল সেন তখন পাল রাজগণের বংশধরগণ ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ফলে রাজরোষের স্বীকার হন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজগণ। এই ধর্ম পরিবর্তন ও রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে নমঃজাতির লোক পাল রাজগণ মেনে নিতে পারছিল না। এই সত্যকে আমরা জানতে পারি 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকে। আচার্য মহানন্দ হালদার এভাবে বর্ণনা করছেন—

''পাল বংশ মহাতেজা বঙ্গদেশে সবে রাজা

বৌদ্ধধর্ম আসিল এদেশে।

বৌদ্ধরাজ ধর্ম্ম মানি বঙ্গবাসী যত প্রাণী

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিল শেষে।

উদার বুদ্ধের নীতি নাহি জানে ভেদ নীতি

জাতি জাতি ভাগ নাহি করে।

প্রেমের নিগড়ে বান্ধি সবে করে কাঁদা কাদি

ভ্রাতৃভাব আনিল সংসারে।''[২১]

ধর্ম নীতির যে সুফল ও কুফল এই বর্ণ ধর্মাবলম্বী ভারতীয় ধর্ম বা ধর্ম সাহিত্যগুলিকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। কোন মানুষ ধর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। তার নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে দেয় ধর্ম। এক রাজ বংশ এক একটি ধর্ম ভাবনায় বিশ্বাসী। রাজ্য শাসন কালে রাজার আদেশই বিধির নির্দেশ স্বরূপ। পরাজিত রাজপরিবার রাজ্যের সমস্ত মানুষেরও নব রাজার আদেশ মানতে বাধ্য হয় অনেকে আবার এই নব নির্দেশ অমান্যকারী ধর্ম রক্ষাকারী ভক্ত মানুষ ও থাকে সমাজে। পাল রাজাগণ সহ তার অনেক সমধর্মী মানুষ সেন রাজগণের আদেশ অমান্য করে পূর্বের বৌদ্ধ ধর্ম নীতির আশ্রয়ে থাকেন। কিন্তু সেন রাজাগণ নবভাবে ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার করেন। প্রবর্তন করেন নতুন ধর্ম সাহিত্য নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রবর্তন করেন কৌলিণ্য প্রথা। নব কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন

করেন তার থেকে অনেক মানুষই বাদ পড়ে যায় নৈতিকতার বিরোধের জন্য। রাজ্যের অনেক মানুষ যারা রাজ আদেশ পালন করেন তাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যারা নিজের ধর্ম-কর্মের পরিবর্তন না করে নব রাজার নির্দেশ অমান্য করেন সেই সকল মানুষের যে চির দুঃখ অনিবার্য হবে এটাই স্বাভাবিক। একথাই আচার্য মহানন্দ হালদার তাঁর গুরুচাঁদ চরিত নিম্নলিখিত ভাবে জানাচ্ছেন—

"বল্লাল সেনের কালে কৌলিন্য প্রথার ছলে
পঞ্চ শূদ্রকুলীন হইল।
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রাজা শ্রীবল্লাল মহাতেজা
রাজ্য মধ্যে করিল ঘোষণা।
বঙ্গভূমি পূণ্য স্থান বৌদ্ধ হল অন্তর্দ্ধান
বৌদ্ধ ধর্ম্মে কেহ থাকিবে না।"[২২]

রাজার আদেশ অমান্য করে ধর্ম রক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক বৌদ্ধ পরিবারের লোকজন। বৌদ্ধ ধর্মকে দেশ ছাড়া করতে পারলেও যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাদের জীবনপণ রক্ষার মধ্যেই বেঁচে রইল পরাজিত বৌদ্ধ রাজ ধর্ম।

"কিংবা দেশ ছেড়ে যাব বনে কি জঙ্গলে রব
নাথাকিব রাজধানী পাশে।
যদি মোরা রাখি ধর্ম মোদেরে রাখিবে ধর্ম্ম
দেখা যাক কিবা হয় শেষে।"[২৩]

এই প্রসঙ্গে মণিমোহন বৈরাগী তাঁর 'অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূলনিবাসীরা ও তাদের ধর্ম ভাবনা' গ্রন্থে নমঃজাতির অতীত ইতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক বিখ্যাত মানুষগুলির কথা বলেছেন। তাঁরা এই নমঃজাতির যথার্থ পরিচয় বহন করেন। মনিমোহন বৈরাগীর মন্তব্যটি হল—

"জনগণতান্ত্রিক পাল রাজাদের পতনের পর সেন রাজত্বকাল থেকেই বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্মের আগমন ঘটলেও পূর্ববুদ্ধ কাশ্যপ মুনির বংশধর রাজা সুদাস, রাজা প্রসেনজিৎ এবং সম্রাট অশোকের যেহেতু পাল রাজত্বকালের পূর্বেই বঙ্গের

বাইরে..... বঙ্গদেশের নমঃ বা চণ্ডালেরা পাল রাজত্বকাল পর্যন্ত কোনদিনই বৈদিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। .....। সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে সরাসরিই তাদের কোন ধর্মীয় অধিকার নেই। তাই তারা পতিত।''[২৪]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আজও নমঃজাতির মানুষ বল্লালসেনের কৃতকর্মকে ভালোভাবে মেনে নেয় নি। একথা কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে নমঃশূদ্র ভৈরব মণ্ডলের ঘৃণার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। ভৈরব বল্লালসেনের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করে বলে—''বল্লাল হামরাদের জাত মারি রাখি গিইছে। হামরা তো জাত মরা ছিলাম না। বল্লাল হামরাদের সাথ আটবা পারছিলম না, তাই জাতে মারে।''[২৫] এছাড়াও আরও অনেক ঐতিহাসিক নমঃজাতির কিছু কথা লিখলেও সঠিক সন্ধান করার এখনও অবকাশ রয়ে যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বাংলার ইতিহাস' ও রমাপ্রসাদচন্দ্রের 'গৌড়মালা' থেকে জানা যানা যায় যে, এখনকার নমঃশূদ্রদের ১৮৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে চণ্ডাল নামকরণের পূর্বে তারা শুধুমাত্র নমঃজাতি নামে পরিচিত ছিলেন, যদিও চণ্ডাল নামে তখনও তাদের ঘৃর্ণিত করা হোত। আলোচ্য নমঃজাতির অতীত ইতিহাস থেকে একথা বলা যায় অতীতে তো বটেই বর্তমানে নমঃজাতি একটি সুবৃহৎ গোষ্ঠীর অধিকারী।

মতুয়া ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। এই ঊনবিংশ শতককে নবজাগরণ কাল বলা হয়। কেননা, বাংলা সাহিত্যে নব ভাবনার দ্বারা যুক্তির দ্বারা নব আলোক প্রাপ্ত হতে লাগল এই সময় থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত করেছিল। বাংলার অচলায়তন ধর্মীয় গোড়ামীর থেকে যুক্তির আলোক ফেলে প্রাচীন ধর্মকে নব ভাবে ভাবনা শুরু হয় এই ঊনবিংশ শতক থেকে। যা ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতকের সমাজের ধর্মীয় রূপকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে। স্বপন বসু ঊনবিংশ শতকের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার যে বর্ণনা করেছেন তার কয়েক ছত্র তুলে ধরছি ঊনবিংশ শতকের বাংলার

ধর্মীয় অবস্থা বোঝার জন্য—

> ''ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে সনাতন হিন্দু ধর্মের ঘোরতর দুর্দিন। পুঞ্জীভূত অনাচার, গ্লানি, হাজারো বিধি নিষেধে এই সময় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অসহনীয় আকার। ধর্ম মানে তখন লোকাচার, কুসংস্কার, যার সুযোগে অধিকার ভোগীদের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা। অতঃপর যখন নানা দিক থেকে হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ হতে লাগল, তখন সনাতনীরা যুগধর্মের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন সংস্কারকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন।''[২৬]

শহরাঞ্চল কলকাতার জীবন স্রোতে শিক্ষার আলোক কিছুটা বিচ্ছুরিত হলেও গ্রামাঞ্চলগুলি তখনও ধর্মীয় ভাবনার দ্বারাই চালিত হত। হরিচাঁদ ঠাকুর এই পল্লী বাংলার সন্তান। হরিচাঁদ ঠাকুর তৎকালীন গ্রামীণ সামাজিক জীবনও তৎকালের ধর্মাচরণ সম্পর্কে সর্বভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন প্রত্যক্ষ গোচর হওয়ার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের নমঃ পরিবারে জন্ম হলেও তারা 'ঠাকুর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ধর্মাচরণের জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর এক বর্ধিষ্ণু নমঃপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুর ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী ছিলেন আদর্শ গৃহী মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় তারা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত সে সকল ভক্ত মানুষের বা সমাজ মানুষের পরিচয় পাই তারা সকললেই কোন ভক্তি ভাবনার দ্বারা ভাবিত ছিলেন। কারণ ঊনবিংশ শতকে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বেই চৈতন্যদেব প্রেমধর্মের প্রবর্তন করেন। সেই ভাবধারা যে কত গভীর ছিল তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন সুন্দর ভাবে। কবি বলেছেন—''বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া''[২৭] এরপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ব করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিকাশ বাঙালি মানসকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তা বাংলা সাহিত্য সম্ভাবের দিকে চোখ ফেরালেই বুঝতে পারি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে প্রেমধর্ম যে ভাবে বিকশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থভাবে বিচার করে বলেছেন—

''বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়া ছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দের কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।''[২৮]

চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে এই সমালোচনা যথার্থই সত্য। এও সত্য যে চৈতন্যদেবই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নব বিস্ময়। কেননা, চৈতন্যদেবের ভাব জীবন ভক্ত সমাজকে যেমন হৃদয় তৃষ্ণা নিবারক প্রেমধর্ম যুগিয়েছিল তেমনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছিল অনন্য সাধারণ সাহিত্য সম্ভার। আর বাঙালি সমাজকে দিয়েছিলেন প্রেম। হরিচাঁদ ঠাকুরের পারিবার জীবনও বৈষ্ণব ভাবানুসারী ছিল। সেই পরিবার জীবনের মধ্যেই প্রথম দেখা যাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রের বিকাশ ও কর্মধারার পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্মকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। যথা;

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের পর্বের সমাজ ধর্মের পরিচয়।
হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক সমাজ ধর্মের পরিচয়।
হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার কার্যাবলীর পরিচয়।

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের পর্বের সমাজ ধর্মের পরিচয় :

প্রাক্ হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ধর্মের আলোচনা করবো 'শ্রীশ্রীহরিলালামৃত' গ্রন্থের সমাজ ও ধর্মভাবনার যে পরিচয় পাই তারই পরিপ্রেক্ষিতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের অনেক আগে থেকেই সমাজে ভক্তিভাবের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবার জীবনের মধ্যেও সেই ধর্মভাবনার পরিচয় পাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণা দেবীর সংসার জীবন ও চালিত হয়েছে ধর্মীয় ভাবাদর্শে। 'যশোবন্ত ঠাকুরের বৈষ্ণব সেবাও বৈষ্ণবদাসের পুনর্জ্জীবন' অংশে দেখা যায় বৈষ্ণবসেবা করছেন যশোবন্ত বৈরাগী কিন্তু

পারনা করা হয় নি অতিথি বৈষ্ণবদের। এমন সময় পুকুরের জলে পড়ে যশোবন্ত পুত্র বৈষ্ণবদাস মারা যায়; কিন্তু বালকের এ হেন পরিস্থিতিতেও বৈষ্ণবসেবার ত্রুটি হবে ভেবে পরিস্থিতির চাপা দিয়েছেন যশোবন্ত বৈরাগী। বৈষ্ণবের সুখের ত্রুটির কথা ভেবেই বালকের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও চুপ করে থাকেন। এহেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন যশোবন্ত ঠাকুর। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে অবলম্বন তার পরিচয় গ্রহণ করব—

''যশোবন্ত সদা দেন বৈষ্ণব ভোজন।।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

একাদশী দিনে সব বৈষ্ণব আসিল।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বাসর করিল।।
নামসংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত বলে হরিবোল।।
বয়স বৈষ্ণব দাস চতুর্থ বৎসর।
একাদশী দিনে গায় আছে কিছুজ্বর।।
পারণা দিবসে হরিবাসর প্রভাতে।
পুকুরের জলে পড়ি মরিল বালক।
এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রেমেতে পুলক।।
দেবী অন্নপুণা দেখি কাঁদিয়া উঠিল।
যশোবন্ত এসে মুখ চাপিয়া ধরিল।।
কান্না শুনি বৈষ্ণবের সুখ ভঙ্গ হবে।
না হবে বৈষ্ণব সেবা সব বৃথা যাবে।।
মরেছে বালক যদি এখানে থাকুক।
অগ্রেসব বৈষ্ণবের পারণা হউক।।
মরা পুত্র যশোবন্ত গৃহে রাখে সেরে।
বৈষ্ণবের সঙ্গে গিয়া হরিনাম করে।।
নামসংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত বলে হরিবল।।

নামসংকীর্ত্তন হইল পারণা হইল।।''[২৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৈষ্ণবীয় যে সহিষ্ণুতা তা হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার মধ্যে প্রগাঢ় রূপেই বর্তমান ছিল। আর তার নৈতিক চরিত্রটিও সর্বত্রই বৈষ্ণানুগত দেখা যায়। আর যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণা দেবীর এই মৃত বালককে ঘিরে সকলের মধ্যেই ভক্তিভাব ব্যক্ত হয়েছে। একথাটিও পরিস্ফুট হয় যে মৃত্যুর সময়কালে মানুষ যে কর্ম বা চিন্তা করে দেহত্যাগ করে জন্মান্তর কালে বা পরবর্তী জন্মে মানুষ সেই শেষকালের ক্রিয়া থেকেই নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়। তাই মৃত্যুন্মুখ বা মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষকে 'হরিনাম' শোনানো হয়। আর এখানে ঘটনাচ্ছলে বালক মারা গেছে কীর্ত্তনের সময় তাই বর্ণনা করে যশোবন্ত বলেছে—

''ধন্য রত্নগর্ভা তুমি তোমার উদরে।
এহেন বালক জন্মে আমাদের ঘরে।।
-------- -------- ---
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক মরিল।।
হেনভাগ্য কার হয় জনম লইয়া।
বৈষ্ণব সেবায় মরে কীর্ত্তন শুনিয়া।।
বৈষ্ণব হইয়া বরং বাচে পঞ্চদিন।
বৃথা সহস্রেক কল্প হরিভক্তি হীন।।
সকল বৈষ্ণব সেবা হইল স্বচ্ছন্দ।
----------''[৩০]

যশোবন্ত বৈরাগী পুত্রকে সকল বৈষ্ণবের সেবার পর বাইরে নিয়ে আসেন ও মাথায় রেখে নৃত্য করে হরিনাম করতে থাকলে বৈষ্ণবগণ বুঝতে পারেন বৈরাগীর নন্দন মারা গেছে। এবং মৃত ছেলেকে মাথায় রাখার কারণ জানতে চাইলে যশোবন্ত বলেছিলেন—

বৈষ্ণবের কথা শুনি যশোবন্ত বলে।
মরেছে বালক মম সাধু সেবা কালে।।
সাধুসেবা হরিনাম শুনে শিশু মরে।
পুত্র নয় সাধু বলে রাখিয়াছি শিরে।।

মরেছে বালক তাতে নাহিক বিষাদ।

মম ভয় বৈষ্ণবের সেবা হয় বাদ।।[৩১]

এই যে নৈতিক আদর্শ তা থেকে বোঝা যায় কতটা স্থির ধীর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যশোবন্ত বৈরাগী। বালকের মুখে জল উদ্‌গীরণ হওয়ার ফলে মৃত বালকের জীবন সঞ্চার হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা মাতাই শুধুমাত্র বৈষ্ণব ছিলেন না অনেক আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব তাদের উপস্য হিসেবে পূজিত হয়েছিল। পরিবারের কৃষ্ণভজনের জন্যই 'ঠাকুর' উপাধি হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস থেকে একথা জানা যায়। তা কবির বর্ণনায় নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

''যশোবন্ত সনাতন প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন,

রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।

সর্ব্ব জেষ্ঠ্য যশোবন্ত, তার হল পঞ্চ পুত্র,

এ পঞ্চের ঠাকুর আখ্যান।।

এ বংশে জন্মিল যত, শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণভক্ত,

সবে মত্ত হরি গুণগানে।

--- --- ---

এ কয় পুরুষ মাঝে মত্ত সাধু সেবা কাজে,

কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।

কেহ বা হল সন্যাসী, কেহ বা বৃন্দাবনবাসী,

তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি।।

ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,

করিলেন জন্মগ্রহণ।।''[৩২]

বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় ঊনবিংশ শতকের আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের আগে সমাজের মানুষের পরিচিতি হত। ভক্ত পরিবার বা বৈষ্ণব পরিবার বা ঠাকুর পরিবার নামে। বাড়ির উপাস্যের নামানুসারেই তাদের পরিচয় হত। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবারের ঐতিহ্য যেমন ছিল ধনাঢ্য পরিবার হিসাবে খ্যাত তেমনি ভক্তিগুণেও ছিল উপাধিতে ঠাকুর। এহেন

পারিবারিক পরিচয়ের উত্তাধিকারী হন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের পারিবারিক বংশ পরিচিতির পরিচয় গ্রহণ করে তৎকালীন সমাজ জীবনের আর একটু বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করবো। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বপুরুষদের পারিবারিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের প্রাক্কালের সমাজ ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করবো। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্ব যুগের সমাজ ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই বলতে হয় রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান বা রামকান্ত গোস্বামীর জীবন কথাকে। তাঁর ধর্মাচরণের মধ্যেই গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনও ধর্মজীবনের পরিচয় রয়েছে। রামকান্ত বৈরাগী একজন সাধক সন্যাসী মানুষ। তিনি বিবাহ করেন নি। তার আরাধ্য দেবতা হল কৃষ্ণ বা বাসুদেব। তিনি এই বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন গ্রামে গ্রামে। তিনি বাসুদেবকে নিয়ে ভক্তালয়ে ভ্রমণ করতেন নৌকায়। আর সেই পরমারাধ্য বাসুকে কেন্দ্র করেই রামকান্ত বৈরাগীর জীবন যাপন। এই রামকান্ত বৈরাগী অন্যান্য ভক্তগণের বাড়ির মত যশোবন্তের বাড়িতে আসতেন। একথা রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান থেকেই জানা যায়—

> ‘‘রামকান্ত নামে সাধু মুখ ডোবা গায়।
> বৈরাগী উপাধি তার সাধু অতিশয়।।
> রামকান্ত যশোবন্ত আলয় আসিত।
> স্ত্রী পুরুষ একত্তরে সাধুকে সেবিত।।
> সদা ছিল সে সাধুর উত্তার নয়ন।
> শিব নেত্র প্রায় যেন আরোপ লক্ষণ।।
> কখন কখন সাধু বেড়াইতে যেত।
> কোন কোন ঠাই গিয়া উপস্থিত হত।’’[৩৩]

বাসুদেব ভক্ত রামকান্ত বৈরাগী যশোবন্ত গৃহে যাতায়াত করত সব সময়। একদিন অন্নপূর্ণা দেবীকে রামকান্ত বৈরাগী পুত্র বর দেন। আসলে রামকান্ত বৈরাগীর নিশ্চিত আশ্রয়স্থল ছিল যশোবন্ত অন্নপূর্ণাদেবীর সংসার। কেননা রামরান্ত বৈরাগী একমাত্র তার প্রাণপ্রিয় বাসুকে এই বাড়িতে রেখে অনত্র চলে যেতেন ভ্রমণ করতে। অন্নপূর্ণাদেবী রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেবকে পরম যত্নসহকারে পূজা করতেন। সেই সময় অন্নপূর্ণাদেবীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণদাসকে নিয়ে তাদের সংসার পরবর্তীতে আরও চার সন্তানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় পুত্র

হরিচাঁদ তৃতীয় বৈষ্ণব দাস, চতুর্থ স্বরূপ দাস, পঞ্চম গৌরীদাস এই পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম হয় অন্নপূর্ণার গর্ভে। রামকান্ত বৈরাগী এই পরমা বৈষ্ণবী অন্নপূর্ণার কাছে ভার দিতেন বাসুদেব পূজার। একথা কবির বর্ণনায়—

''রামকান্ত কহে যশোবন্ত বৈরাগীরে।
কিছুদিন বাসুদেবে রাখতব ঘরে।।
ওঢ়াকান্দি মাচ কাঁদি ঘৃত কাঁদি আদি।
বহু গ্রামে ভ্রমিতেন কান্ত গুণনিধি।।
দুই চারিদিন পরে অথবা সপ্তাহে।
মাঝে মাঝে আসিতেন অন্নপূর্ণা গৃহে।।
অন্নপূর্ণা পূজিতেন বাসুদেব জীরে।।''[৩৪]

এহেন ভক্তি মতি মাতাকে রামকান্ত বৈরাগী বরদান করেন এই বলে—

''রামকান্ত বলে মাগো বলি যে তোমারে।
বাসুদেব জন্মিবেন তোমার উদরে।।''[৩৫]

এই যে পুত্রবর দেওয়া অন্নপূর্ণাকে তার সত্যাসত্য বিচার যোগ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাই হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের মধ্যে। এক মহাসাধকের জীবন জনমানসের কল্যাণে ব্রতী হয় এই মহাসত্য থেকে রামকান্ত বৈরাগী ও ব্যতিক্রমী নন। আর তার এই পুত্র বরদানের যে অনন্ত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল মাতার উপর তার সত্যই যথার্থতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই। হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। রামকান্ত বৈরাগী বাসুকে ঘিরে জীবন যাপন করতেন ও যে সময় যা পেতেন তার ভক্তদের কাছে তাই রান্না করে বাসুদেবকে ভোগ দিতেন। আর রামকান্ত বৈরাগী ভক্ত হৃদয়াধারে দেখতেন বাসুদেব খেতেন। এভাবে বাসুদেব সেবা পূজা করতেন রামকান্ত বৈরাগী। কিন্তু এই ভোগ দর্শন করেন গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ রামকান্ত বৈরাগীর যে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার আছে তা বিগ্রগণ জানতেন না। তাদের ধারণায় রামকান্ত বৈরাগীর অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার নেই।

'মতুয়া ধর্ম' সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করতে হলে প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পরিবার জীবনকে আলোচনা করতে হয়। কেননা তৎকালীন সমাজ জীবন ভাবনা, ধর্মজীবন,

ভাবনা ও শিক্ষা ভাবনা ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক যে জীবন ভাবনা তার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনীমূলক আকর গ্রন্থে। ধর্মভাবনামূলক, সমাজ মানুষের যে পরিচয় পাই তা মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহজীবন পালনের মধ্যেই রয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবার সকলেই গৃহী মানুষ ছিলেন, তার অনুগামী মানুষেরাও গৃহধর্ম পালন করেছেন। তিনি সর্ব প্রথমেই অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সমাজজীবনের মূল মেরুদণ্ড আদর্শ গৃহজীবন যাপন করা। তাই প্রথম থেকেই দেখা যায় চরিত্রাদর্শে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহধর্মাবলম্বী। যে আদর্শ মানুষকে আত্মচৈতন্য দান করে, মানুষের আত্মজাগরণ ঘটায় এবং মানব জীবনের সর্বসৌন্দর্যের সন্ধান দিয়ে মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটায়, সেই জীবনাচরণই ধর্ম নামে কথিত হয়।

'শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের জন্ম বিবরণ' অংশ থেকে স্পষ্টভাবে দুটি ধারার বিবরণ পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের জীবনের ধর্মীয় ভাবধারার ও পরিবর্তন হয়েছে। আর একথাও অনিবার্য ভাবে সত্য যে শিক্ষা বলতে মূলত ছিল ধর্ম শিক্ষা। মানুষ বাল্যকালে গুরু গৃহকেই শিক্ষা লাভ করত বা গুরুদেব যোগ্য শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন যা মানুষের জীবনের উপযোগী এভাবেই মানুষ ধর্মচারণ শিক্ষা লাভ করে গৃহধর্ম তথা তার জীবন অতিবাহিত করত। আর শিক্ষা গ্রন্থ হিসাবে ধর্ম সাহিত্যগুলিই হল গ্রন্থ। আর এই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা হলেও গ্রামাঞ্চলগুলি ছিল সেই চিরপ্রাচীন প্রথার দ্বারাই প্রভাবিত। ঠাকুরের জন্ম হয় যে মানুষের সমাজে তারা হল নমঃজাতির মানুষ। নমঃ জাতির ঐতিহ্য থেকে বোঝা যায় এরা মূলত ধর্মপ্রাণ মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় বা তার পূর্বে সমাজে ছিল কৃষ্ণ ভক্তির প্রাবল্য অপর দিকে ছিল বৌদ্ধ ভাবনা। আর ঐতিহাসিক সত্য থেকেও জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মের রাজাদের পরাজয় ঘটলে সেনরাজাগণ হিন্দুধর্ম সংস্কার করেন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন। সমাজ জীবনের মানুষের জীবনে একটি ধর্মাদর্শ ছিল না। ছিল মিশ্র ভাবনা। সেই মিশ্র ভাবনার যে ফলশ্রুতি বা পরিণতি তা আমার আলোচ্য 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের উপর যে ভক্তির শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদিত হয়েছে সে শ্রদ্ধা ভক্তিও ভক্তিতে যে ভগবান এক হন ভিন্নতার পরিবর্তে তারই পরিচয় পাই। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন একজন ভক্তি ভাবাপন্ন সাধক মানুষ। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালীন সমাজের

মানুষ যেভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তি করতেন সেই সকল ভাবনার বিষয়গুলি তার রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সমাজে ভক্তি ভাবনার একটি সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন তিনি আদি অন্তহীন চিরকল্যাণময় ভগবান রূপে বন্দিত হয়েছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। তিনি এই মানুষ্য জীবন ধারণ করেছেন সকল দুঃখের সকল অসাম্যের সকল অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে মানুষের জীবনকে পূর্ণ সত্তায় জাগরণ ঘটানোর জন্যই। তাই প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষ রূপে বর্তমান থাকলেও তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি ভগবানের মূর্ত প্রতিক রূপে পূজিত হয়েছেন। তার চরিত্রাদর্শ ভগবানের মানুষ রূপের প্রকাশকেই কবি উপলব্ধি করে গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। কবির সেই ভগবান মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের বর্ণনাটি হল—

''হরিচাঁদ চরিত্র সুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার।।
.....
.....
যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।
.....
সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
রামহরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ তাঁর সমিভ্যরে।
.....
নিত্যনন্দ হরি কৃষ্ণ হরি গৌর হরি।
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।।''[৩৬]

কবিরসরাজ তারচন্দ্র সরকার যে হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রকে আমাদের উপহার দিয়েছেন সেই মানুষ রূপী হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভগবানরূপী হরিচাঁদ ঠাকুরের কোন পার্থক্য নেই। কেননা হরিচাঁদ ঠাকুর সত্যিই মানব প্রেমের মূর্ত প্রতীক। মানুষকে আত্মচৈতন্য দান করেছেন যেমন

তেমনি মানুষের যে ব্যক্তিগত দুঃখ দারিদ্র তা থেকে ও উত্তরণের পথ নির্দেশ করেছেন। মানুষের উত্তরণ ঘটেছে তা আজ সর্বভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। আর একটি উদ্ধৃতিতে মানবতাবোধের পরিচয় পাই নিম্নলিখিত বাক্য দুটিতে যা মানুষের জীবনের হিংসা নিন্দা কলহ থেকে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সহায়ক। কবির বর্ণনায়—

যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।

ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।[৩৭]

প্রেমভক্তি অর্থাৎ অহিংসার মাধ্যমে মানুষের জীবনের অগ্রগতিই হল কাম্য। আর ভক্তি মানুষের অন্তরে জন্মাবধি প্রথম থেকেই বিদ্যমান থাকে তারই পূর্ণ বিকাশ। সেখানে কোন জোর বা আরোপ চলে না। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গও মানুষের কাছে হরি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার সকলকে আবার হরি অভিধায় অভিহিত করে অর্থাৎ পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই শেষে বলেছেন—

''হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।''[৩৮]

এই হরিচাঁদ ঠাকুরকে কবিরসরাজ তারক চন্দ্র কথিত 'হরিচাঁদ হরি পূর্ণানন্দহরি'র সমাজ জীবন ও গৃহজীবনাদর্শকে আলোচনা করে দেখব তার ধর্ম ভাবনার মূলাদর্শকে। হরিচাঁদ ঠাকুর যে ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন মানব জাতীর কল্যাণে কবি কথিত সেই ধর্ম হল সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। কবির বর্ণনায়—

'মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সুত হয়ে,

জন্ম নিল সফলা নগরী।

প্রচারিল গূঢ়গম্য, সূক্ষ্ম সনাতন-ধর্ম্ম।

জানাইল এজগত ভরি।''[৩৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে ধর্মপ্রচার করেন তা সূক্ষ্ম সনাতনধর্ম। প্রচার করলেন সনাতন ধর্মের গূঢ়ার্থকে। অর্থাৎ মানুষের ধর্মের শাশ্বত কালের যে নিত্য প্রবাহমান ধর্ম সেই সনাতনী প্রথাকেই প্রচার করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের জীবনের সার্বিক উন্নতিকল্পে নবভাবে গঠন করে নিলেন মানুষের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই করেছিলেন তিনি। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার প্রথম যে জন্মগ্রহণের কারণ হিসাবে

উপস্থাপন করেছেন তা সত্যই আশ্চার্যজনক ঘটনা। জীবনের সার্বিক সাফল্যের স্তরে পৌঁছানোর জন্য তিনি যেভাবে ধর্ম সংস্কার করলেন মানুষের প্রয়োজনে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার মূল মন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন তা হল—

"এ লীলায় হৈল প্রভু যশোবন্ত পুত্র।।
কিসের রসিক ধর্ম্ম কিসের বাউল।
ধর্ম্ম যজে নৈষ্টিকেতে অটল আউল।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙিঘ এবে করিলেন স্থূল।
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।
মুখে বল হরি হরি হাতে কর কাজ।
হরি বল দিন গেল বলে রসরাজ।।"[৪০]

হরিচাঁদ ঠাকুর নামধর্ম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'হরিনাম' মানুষের জীবনের মূল আরাধ্য বিষয়কেই গ্রহণ করে সমস্ত প্রচলিত শাস্ত্রীয় নীতিকে লঙঘন করেছেন মানব জীবনের পূর্ণ আদর্শে পৌঁছানোর জন্য। কেননা সেই সমাজে কোন একটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল না। বিভিন্ন ভাবাদর্শ সমাজে প্রচলিত ছিল। আর সেই অনিবার্য গতির যাত্রাপথকে একমুখী করার ও মানুষের জীবনের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে কার্যটি সম্পন্ন করলেন তা হল এক সাফল্যের জয় যাত্রা। যা আজ পর্যন্ত সমাজে বিরল ঘটনা। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই কর্মধারা তৎকালীন সময়ে অনেক কঠিন হলেও তা সাফল্যের সঙ্গেই করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ের ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অপরিনাম দর্শি ভাবনা বা সমাজের মধ্যে কলুসতার প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। বিনয় ঘোষের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' ও স্বপন বসুর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' থেকে পরিপূর্ণভাবেই অবহিত হওয়া যায়।

এছাড়াও স্বপন বসু তৎকালীন প্রকৃত হিন্দু দলপতিদের চরিত্রকে তুলে ধরেছেন যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় মানুষের জীবন কেমন কলুসতা পূর্ণ ছিল ধর্মাচারণ করা সত্ত্বেও।

স্বপন বসুর অভিমতটিকে আলোচনার সুবিধার্থে গ্রহণ করলাম—

> ''হুতোম কলকাতার অনেক 'প্রকৃত হিন্দু দলপতির' আসল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন; 'সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু, বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁঢ় আছে। ... , এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে প্রাতঃ স্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীত গোবিন্দও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন-হঠাৎ লোকে মনে করতে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতে প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদায় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন।''[৪১]

এই যে ধর্ম জীবন যাপন করা মানুষ। এই চরিত্রের মানুষের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা নাম দেন 'বিড়াল ব্রহ্মচারী'। এহেন সামাজিক পরিস্থিতি হল শহর কলকাতায়। তার যে একটুও প্রভাব ছিল না গ্রামাঞ্চলে তা বলাই বাহুল্য। আর এই সামাজিক পরিস্থিতিতেই হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব। এ যেন সমাজের সকল কু-প্রভাবের সময়; সমস্ত প্রকার কলুসতাকে সমূলে উৎপাটন করতেই হয়েছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব। এই হরিচাঁদ ঠাকুর কলকাতার মানুষ নন ঠিকই কিন্তু তিনি শুধু গ্রামের মানুষের জন্য ধর্ম ভাবনার প্রবর্তন করেননি সামগ্রিক মানুষের কল্যাণের যা কিছু প্রয়োজন সেই কর্মাদর্শ সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জাগরণ করেন। আর প্রচলিত সমাজের তিনি কোন একটি দিকের সংস্কার করেন নি। তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আমূল পরিবর্তন করে নবভাবে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জাগরণ ঘটালেন।

'শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্ম বিবরণ' অংশ থেকে জানা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজের পতিত মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন। কবির বর্ণনায় সমাজের মানুষের উদ্ধার করার জন্যই হরিচাঁদ ঠাকুরের আগমন—

> ''বুদ্ধদেব অবতার যে সময় হয়।।
> বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।
> যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।।
> .....

এদেশে থাকে না যেন জাতির বিচার।”[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুর যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সমাজে কৃষ্ণ ভক্তি থাকলেও তা ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে সমাজের উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের আচরণীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। ধর্ম আচরণ ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে মনুষ্যত্ব বোধের আলোক দান করে সমাজের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হবে এটাই আকাঙ্খিত। কিন্তু রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব পূজাকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সৃষ্টি তা মূলত ধর্মাচারণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। রামকান্ত বৈরাগী বাসুদেবকে অন্নভোগ নিবেদন করতেন। তিনি ছিলেন নমঃ জাতির মানুষ। আর আশ্চার্য জনক ভাবে এই নমঃ জাতির সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্থ বর্ণের শেষ বর্ণটির ‘শূদ্র’ শব্দটি নমঃজাতির সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই বিশাল বৃহৎ আকার জন গোষ্ঠিটিও চতুবর্ণের শেষ বর্ণে পরিণত হয় বর্ণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে। তার নিখুঁত চিত্র রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব পূজার অন্নভোগ দেওয়ার চিত্রটি থেকে বোঝা যায়। সমাজের উচ্চবর্ণ বলতে যে ব্রাহ্মণকেই বোঝায় তা বোঝা যায়। এক অর্থে যেমন রামকান্ত বৈরাগীর পূজাপোকরণ থেকে সমাজ জীবনে রামকান্ত বৈরাগীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় যেমন পাই আর উচ্চবর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ যেমন বর্ণশ্রেষ্ঠ তেমনি অর্থেও ছিল স্বচ্ছল তার পরিচয় আমরা এই রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান থেকে পাই। ব্রাহ্মণগণ জোর করে বাসুদেবকে নিয়ে গিয়ে আড়ম্বর সহকারে পূজার আয়োজন করেন সেখান থেকেই দুই মানুষ জাতির সামাজিক, আর্থিক পরিচয়টি পাওয়া যায়। ধর্মের নামে কত অসামাজিক তথা অমানবিক ক্রিয়া হত তার পরিচয় দিয়েছেন—কবি রসরাজ তাঁর ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থে। ‘রামকান্ত বৈরাগীর পূর্ব্বাপর প্রস্তাব কথন’ অংশের বর্ণনা থেকে মানুষের মনের সংকীর্ণতার তথা নীচ মানসিকতার চিত্রটিকে যেমন দেখব তেমনি রামকান্ত বৈরাগীর ভক্তির পরিচয় গ্রহণ করব। প্রথমে রামকান্ত বৈরাগীর বাসুদেব ভক্তির পরিচয় নেব। বাসুদেব ভক্তি কথাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন কবিরসরাজ তারক সরকার—

“বাসুদেবে সমর্পিয়া আত্ম স্বার্থ আত্মা।
ব্রজের মাধুর্য্যভাবে করিত মমতা।।
সাধুর সঙ্গেতে ছিল বাসুদেব মূর্ত্তি।
কভু সখ্য ভাব কভু ব্রজভাবে আর্ত্তি।।

ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি আতপ তণ্ডুলে।

পূজিতেন রম্ভা দুর্ব্বা তুলসীর দলে।।

নিবেদিয়া করিতেন ভোজন আরতি।

বাসুদেব খাইতেন দেখিত সমতি।।

মূলা থোড় মোচা কাচা রম্ভার ব্যঞ্জন।

আতপের অন্ন দিত নাদিত লবণ।।

ছোলা ডাল মুগ বুট গোধুম চাপড়ী।

তৈল হরিদ্রা বিনে ঘৃত পক্ক বড়ি।।

ভোগ লাগাইয়া সাধু আরতি করিত।

বাসুদেব খেত তাহা চাক্ষুস দেখিত।।[৪৩]

এভাবে রামকান্ত বৈরাগী প্রতিনিয়ত বাসুদেবের ভোগ দিত ও নিজেই পূজার সমস্ত কাজ করত। এর পরবতীতে দেখা যায় বৈরাগী বাসুদেবকে ভোগ নিবেদন করলে গ্রামবাসী একজন বিপ্র এসে বাসুদেবের পূজা পদ্ধতি দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছে বৈরাগীকে যে বাসুদেবকে অন্ন দিলি শূদ্র হয়ে এটা শাস্ত্রীয় মতে অবিধি। একমাত্র ব্রাহ্মণের অন্নভোগ অধিকার আছে। এই যে অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অন্ন রান্না করে ভোগ রাগ দিলে অকল্যাণ হয়। কিন্তু এই যে অন্ন ভোগ অধিকার, গোত্র হিসাবে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য এইভাবে চারটি গ্রোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধা দশ দিনে জ্ঞাপন করা এগুলি সবই কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণ বলে পরিচিত ব্রাহ্মণের আচরণের সঙ্গে মিল হওয়া সত্ত্বেও নমঃজাতির মানুষ ব্রাহ্মণ নয়। এদের অতীত ইতিহাস রয়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ধর্ম, বিবাহ তথা সকল বিষয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের মিল পরিলক্ষিত হলেও এরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মানুষ নয়। নমঃজাতির মানুষের নিজের ঐতিহ্য সহ এই সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং একথা বলা যায় এই নমঃজাতির মানুষ এখনও অন্নদানের অধিকারী। আর তা রামকান্ত বৈরাগীর মতই এখনও তা ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিদেবীকে ভক্তিভাবে নিবেদন করে থাকেন। এছাড়াও বলা যায় যে নমঃজাতির অনেক মানুষ কৃষ্ণ ভক্ত আছে তারাও যথাসাধ্যই অন্ন ভোগ দেন শ্রীকৃষ্ণকে। ধর্ম শিক্ষার জ্ঞানালোক মানব জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ না হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হলে সমাজ জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়। পরবর্তীতে নতুন

ধর্মসংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। যা মতুয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিপ্রমহাশয়ের বাসুদেব ভোগদর্শনের পর যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায় তা নিম্নরূপ—

একদিন গ্রামবাসী বিপ্র একজন।
বাসুদেব ভোগরাগ করিল দর্শন।।
ক্রোধ করি বলে বিপ্র এ কোন বিচার।
শূদ্রের কি আছে অন্নভোগ অধিকার।।
শূদ্র হয়ে বাসুদেবে অন্ন দিলি রাধি।
কোথায় শুনিলি বেটা এমত অবিধি।।
হারে রে বৈরাগী তোর এত অকল্যাণ।
শূদ্র হয়ে হবি নাকি ব্রাহ্মণ সমান।।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব ক্রোধে উঠে জ্বলে।।
দশজন বিপ্র গেল ব্রাহ্মণের বাড়ি।
ক্রোধ ভরে বাসুদেবে লয়ে এল কাড়ি।।[৪৪]

জোর করে বাসুদেবকে নিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ গৌরবের আত্ম অহংকারে কিন্তু প্রকৃত পূজারী ঐ রামকান্ত বৈরাগী তা তার আত্মাভিমানী অভিমানেই প্রকাশিত হয়। বাসুদেবকে ছেড়ে দিলেন আর বাসুদেবকে বলেন—

''কাঙ্গালের কাছে তুমি ছিলে অনাদরে।
আদরে খাইও এবে ষোড়শো পচারে।।
ভাল হল ব্রাহ্মণেরা লইল তোমারে।
সুখেতে থাকিবা এবে খট্টার উপরে।।
দুঃখিত দরিদ্র আমি কপর্দ্দক নাই।
বহুকষ্টে থোড় মোচা তোমারে খাওয়াই।।''[৪৫]

এই বাসুদেবকে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পূজার দ্বারা ভক্ত হয়েছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বাসুদেব পূজার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সামাজিক অর্থনৈতিক যে স্বচ্ছলতা রয়েছে ব্রাহ্মণদের সেটা বোঝা যায়—

ব্রাহ্মণেরা বাসুদেবে লয়ে হরষেতে।

বাসুদেবে অভিষেক করে তন্ত্রমতে।।

কেহ বলে রাখ দেবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে।

জাতিনেশে নমঃশূদ্রের পক্ক অন্ন খেয়ে।।

.....

.....

সবদ্বিজ বাসুদেবের ভক্ত হইল।

পূজারি ব্রাহ্মণ এক নিযুক্ত করিল।।

সন্ধ্যাকালে ঘৃত দ্বীপ পঞ্চবাতি জ্বালি।

আরতি করেন সব ব্রাহ্মণ সব বাক্ষণ মণ্ডলী।

.....

এইরূপে বাসুদেব ব্রাহ্মণের পূজ্য।''[৪৬]

এর পরবর্তীতে রামকান্ত বৈরাগী বাসুদেব দর্শনে গিয়ে মণ্ডপের পিছনে থেকে অন্তরে বাসুদেব দর্শন করেছেন। কিন্তু সামনে গিয়ে দেখতে ভয় হয়। কারণ অন্তরে ভীত হয়েও ভক্তের অন্তরের প্রেরণাকে উপেক্ষা করতে পারে নি। এভাবে কিছুদিন পর বাসুদেবজীকে স্নান করানোর জন্য পুকুরে নিয়ে গেলে জলের ভিতর হারিয়ে যায় বাসুদেব। কোন বিপ্রগণ বাসুদেবকে সন্ধান করে পায় না কিন্তু রামকান্ত বৈরাগী স্পল্প সন্ধানেই বাসুকে পানও বিপ্রগণের অনুরোধেই পুনরায় বাসুদেবকে নিয়ে যান আপন আলয়ে। এভাবে অনেক দিন রামকান্ত বৈরাগীর কাছে বাসুদেব থাকার পর রামকান্ত বৈরাগী বৃদ্ধ হন এবং শেষ ইচ্ছা হয় বাসুদেবকে রথে চড়াবেন। রথ নির্মাণ করেন বাঁশ দিয়ে রামকান্ত বৈরাগী শেষ ইচ্ছা পূরণের আগেই বাসুদেবকে আবার নিয়ে যায় বিপ্রগণ। বিপ্রগণের মনে ভয় ছিল রামকান্ত বৈরাগী রথযাত্রা উৎসব করলে বৈরাগীর রথযাত্রা। উৎসবে সকল লোকের সমাগম হবে ও অপরদিকে ব্রাহ্মণদের রথযাত্রা উৎসবে লোক হবে না। এমতাবস্থায় বিপ্রগণের সিদ্ধান্ত হল বাসুদেবকে পুনঃরায় কেড়ে নিয়ে আসার। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন এই বিরোধের চিত্রকে। কবির বর্ণনায়—

''অধিবাস দিনে সব লোক আসে যায়।

লোকের সংঘট হল লোকারণ্য ময়।।

ব্রাহ্মণেরা সবে মিলে করে পরামিশে।

রথযাত্রা না হইতে এত লোক আসে।।

আমাদের রথে কল্য মানুষ হবে না।

বৈরাগীর রথে কল্য লোক ধরিবে না।

ভাল বলি বাসুদেবে দিলাম ফিরায়ে।

.....

আর বার বাসুদেব লয়ে এস কাড়ী।।"[৪৭]

রামকান্ত বৈরাগী পুনরায় অন্তর্বেদনা পান কিন্তু রামকান্ত বৈরাগী রথযাত্রার শেষে রথের তলায় আত্ম বিসর্জন দেন। এই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বে সমাজে ধর্ম আচরণের জন্য মানুষের মধ্যে মতো বিরোধ ছিল। এ থেকে বোঝা যায় ধর্মজীবন সর্ব সাধারণের পালন করা কত দুঃসাধ্য ছিল।

হরিচাঁদ সমসাময়িক সমাজ ধর্মের পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয় বাংলা ১২১৮ সালে আর ইংরেজি ১৮১২ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। এই সমসাময়িক সময়ে বাংলার যে সমাজ ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত সমাজ সংস্কারের চিন্তা ভাবনা। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসার ঘটান সমাজে। আর এই সময় ইংরেজ শাসকগণ ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তাদের শিক্ষার বিস্তার ঘটান মূলত তাদের কর্ম উপযোগী করার জন্য। খ্রীষ্টান ধর্মও প্রচার করেন অনেক খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক। এক দিকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে ভারতীয় গোড়া হিন্দুগণ তাদের রক্ষণশীল মনোভাবকে বজায় রাখতে ইংরেজগণের সঙ্গে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হতেন। সমাজের মুখ্য কর্ম স্থান ধর্ম প্রচার, শিক্ষা ব্যবস্থার, অগ্রগতি মূলকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা হয়ে ওঠে জনমুখর। যা কিছু নব ভাব ধারা পাশ্চাত্য থেকে আগমণ ঘটত তা কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। তখন সমাজ জীবনে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল ও সমাজে ধনী শ্রেণির একটি প্রভাব ছিল। জমিদারগণ কখনোই প্রজা কল্যাণ মূলক কাজের থেকে প্রজা পিড়ক হয়ে সমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন। আর এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে

জমিদারদের থেকে তাদের কর্মচারীগণ অধিক অত্যাচার করতেন সমাজের কৃষক প্রজাদের উপর।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

''শুভ গ্রহ নক্ষত্র শুভ লগ্ন হইল।
মাহেন্দ্র সুযোগে পুত্র প্রসব করিল।।
বারশ আঠার সাল শ্রীমহাবারুণী।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি যে ফাল্গুনী।।
হরিশাল বলিশাল ভক্তগণে গণে।
নাহিক বৈদিক ক্রিয়া শ্রীবারুণী বিনে।।
ধন্য অন্নপূর্ণা হেন পুত্র পেল কোলে।।''[৪৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ সময়টি ত্রয়োদশী তিথি কৃষ্ণপক্ষ শ্রীমহাবারুণী। হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের এক বর্ধিষ্ণু নমঃ কৃষ্ণভক্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় তিনি জন্মগত পরিচয়ে ঠাকুর পরিবারের সন্তান। বাল্যকালের খেলাচ্ছলে তিনি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। যেমন বালক বন্ধুদের সাথে মিশে সাপ ধরে পদ্মপুরাণ, মনসাভাষাণ গান করতেন। আবার বাল্য খেলার ছলেই মৃতপ্রায় বিশ্বনাথের জীবন রক্ষা করে সকলেরকাছে 'ব্রহ্ম পরৎপর' রূপে চিহ্নিত হন। বালক হরিচাঁদ সকলের কাছে তার কাজ কর্মের দ্বারা 'হরি' রূপে প্রকাশ হলেন। এরপর হরিচাঁদ ঠাকুরকে তাঁর পিতা যশোবন্ত বৈরাগী বিবাহ দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় কৈশোর কালে পূর্ণ যৌবন কালের আগেই বিবাহ দেন। বোঝা যায় তখন বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

''বিবাহ করিল প্রভু কৈশোর সময়।''[৪৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে শ্রদ্ধা করতেন খুব। রামকান্ত বৈরাগী যখন যশোবন্ত বৈরাগীর বাড়িতে আসতেন ও অন্যান্য অনেক অতিথি ব্রাহ্মণ বর্গের আগমণ ঘটলেও রামকান্ত বৈরাগীকেই হরিচাঁদ ঠাকুর তার মনোনীত কথা বলার জন্য নির্জনে দুজনে গিয়ে বাক্যালাপ করতেন। এছাড়া হরিচাঁদ ঠাকুর চরিত্রের প্রকৃতি ছিল নিরপেক্ষ। মানুষের নিন্দা ভৎর্সনার দ্বারা কোন প্রকার যন্ত্রণার কারণ তিনি হতেন না একথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার স্পষ্ট

ভাষায় ব্যক্ত করছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের অনেক পরে রামকান্ত বৈরাগীর দেহাবসান হয় অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুর রামকান্ত বৈরাগীকে দেখেছিলেন এবং তার ধর্মাদর্শকেও সঠিক ভাবে জানার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটি যথার্থই 'মানুষ শ্রীহরি' রূপে প্রকাশিত হয়েছে—

''ঠাকুরের জন্ম অগ্নে পরে যে সময়।
রামকান্ত আসিতেন মোহান্ত আলয়।।
বৈরাগী ব্রাহ্মণ আদি অতিথি আসিত।
কারুণা কহিত প্রভু নিজ মনোনীত।।
নিন্দা কি বন্দনা কারু কিছু না করিত।
রামকান্ত এলে গিয়া পদে লোটাইত।।
কিছু অন্তরেতে রামকান্তে লয়ে যেত।
দুই প্রভু একাসনে নির্জ্জনে বসিত।।
রামকান্তে বলিতেন তুমি মম গুরু।
যুগে যুগে তুমি মোর বাঞ্চা কল্পতরু।।
.....
কথোপকথনে কাটাতেন দিবা রাতি।।''[৫০]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভগবান আদি শ্রীহরি রূপেই বন্দিত হয়েছেন। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের সহধর্মীণি শান্তি ও সেই ভগবান সহচরী রূপেই সকলের মাতা রূপে বন্দিত হয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই হরিচাঁদ পূর্ব ধর্ম ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রামকান্ত বৈরাগীর নিজস্ব ধর্মাচারণ সম্পর্কে বাধার সম্মুখিন করে তাঁকে অপমানিত করেছেন নয় মানুষ জাতির প্রতিনিধির প্রতি যেন তাদের অবমাননা বর্ষিত হয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করলেই তাঁর মানুষের কল্যাণের উন্নতির জন্য যে ভাবনা পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রচার করেছেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে। হরিচাঁদ ঠাকুর বিবাহ করেন শান্তিদেবীকে। শান্তিদেবীর পরিচয় সম্পর্কে 'শ্রীশ্রীহরিচলীলামৃত' গ্রন্থের থেকে জানা যায়—

''জিকাবাড়ী নিবাসী লোচন প্রামাণিক।

একমাত্র কন্যা ভালোবাসে প্রাণাধিক।।

.....

.....

বাল্যকালে যখনেতে করিতেন খেলা।

বালিকাগণের সঙ্গে করিতেন খেলা।।

আয়গো ভগিনী মোরা খেলিব সকলে।

সর্ব্ব মঙ্গলার পূজা করি সবে মিলে।।''[৫১]

শান্তিদেবীর সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের বিবাহ দিলে তাঁদের জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারবে একথা লোচন প্রামাণিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুনেছিলেন যে হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্য খেলার সময় বিশাকে বাঁচান। তাই এই ছেলে যে সামান্য হবে না এটাই তার ধারণা। তাই লোচন প্রামাণিকের কথায় স্পষ্ট বোঝা যায়—

''হরির সঙ্গেতে দিলে শান্তির বিবাহ।

ইহকাল পরকাল হইবে নির্ব্বাহ।।

লোচন সাফলা ডাঙ্গা আসিয়া আসিয়া।

যশোবন্তে কথা কয় হাসিয়া হাসিয়া।।

তোমার মধ্যম পুত্র আমি তাঁরে চাই।।

কন্যা দিয়া আমি তাঁরে করিব জামাই।।

শুনি যশোবন্ত বড় হল আনন্দিত।

বলে এই কর্ম কর যে হয় উচিত।।

আসা যাওয়া দেখা শুনা হল রীতি মতে।

কন্যা দান করিলেন শুভ সুলগ্নেতে।।''[৫২]

এভাবে যশোবন্ত বৈরাগী পাঁচ ছেলের বিবাহ দেন ও নিজে সংসার থেকে সম্পূর্ণ তরে বিশ্রাম নেন। হরিচাঁদ ঠাকুর বড় ভাই কৃষ্ণদাস ঠাকুর উপর সংসার ভার অর্পণ করে নিজে তার সহচরদের সঙ্গে বেড়াতেন। এমন সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের জমিদার সূর্যমণি মজুমদারের জমিদারী রক্ষা করেন কৃষ্ণদাস ঠাকুর সাতশত টাকার বিনিময়ে। জমিদার মহাশয়ের উপকার

করেন কিন্তু শেষে কর্জ শোধ দিতে অস্বীকার করেন জমিদারের গোমস্তা এবং বিরোধের সূচনা হয় জমিদার ও প্রজার মধ্যে। জমিদার কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বিষয় সম্পত্তি অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করে নেন। কৃষ্ণদাস ঠাকুরের পরিবার তাদের মাতুল বংশের আশ্রয়ে থাকেন ওড়াকান্দি। এর আগে প্রথমে কিছুদিন রামদিয়া সেনদেন বাড়িতে থাকেন। পরবর্তীতে ওড়াকান্দিতেই হরিচাঁদ ঠাকুর তার কর্মাদর্শের পূর্ণ প্রকাশ করেন। কবির বর্ণনায়—

''কতদিন পরে সেই রাম দিয়া ছাড়ি।
থাকিলেন ভজরাম চৌধুরীর বাড়ি।।
চৌধুরীর বাসা বাড়ী ওড়াকাঁদি গ্রাম।।''[৫৩]

এরপর যখন ওড়াকাঁন্দি কৃষ্ণদাস ঠাকুর সহ সকল ভ্রাতা একসঙ্গে বাস করছিলেন সেই সময় জমিদার তার পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাদের পূর্ববাস স্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও তারা আর ফিরে গেলেন না পূর্ব ভিটায়। কবির ভাষায়—

''স্থান ত্যাগী ওড়াকাঁন্দি আছে পঞ্চভাই।
জমিদারে লুঠে নিল বিত্ত কিছু নাই।।
পাব্বর্তীচরণ বাবু ওড়াকাঁন্দি গিয়া।
প্রভুদের বলিলেন বিনয় করিয়া।।
বহুস্তুতি মিনতি করিল বারেবার।
সফলা নগরে যেতে করি পরিহার।।
কৃষ্ণদাস বলে শুন শুন মহাশয়।
আর না হইব প্রজা তোমার ভিটায়।।''[৫৪]

এই সময় তারা পঞ্চভাই ওড়াকাঁন্দি স্থায়ী ভাবে আবার বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁদের পরিবার তখনও ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ওড়াকাঁন্দি বাসকালে পঞ্চভাই পৃথক অন্ন হলেন। তাদের পৃথক হওয়ার সময় বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যবসা করে ছিলেন এবং সেই অর্থকে সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেন। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের মামাত পিস্তাত দশ ভ্রাতার মিলন হয় এবং এরা সকলেই এক আত্মা এক প্রাণ ছিল।

''এক আত্মা এক প্রাণ তুল্য দশ ভাই।
পিস্তাত মামাত ভ্রাতা ভিন্ন ভেদ নাই।।

বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিল ভজরাম।

প্রভুদের সঙ্গে সদা করে হরিনাম।।

হরি কথা কৃষ্ণকথা হয়ে একত্তর।

কোন কোন দিন নিশি অইভাবে ভোর।।

.....

তথা আসি পারিষদগণের মিলন।

রাত্রি দিবা করিতেন হরিসংকীর্ত্তন।''[৫৫]

বাল্যকালের অসাধারণ জ্ঞানালোকের অধিকারী বালক পূর্ণ যৌবনে এসে তার প্রকৃত সহদরদের সাহচর্য ও ভ্রাতৃবোধের বন্ধনে মানবত্বের পূর্ণ জ্ঞানে বিকশিত হতে সক্ষম হয়েছেন। সকলকে ধর্ম জাগরণের দ্বারা জাগরিত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার কার্যাবলীর পরিচয় :

হরিচাঁদ ঠাকুরকে পতিপাবন বলা হয়। আর ঠাকুরের বন্দনা অংশেও বার বার এই হরিচাঁদ পতিত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে।

''পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার।।''[৫৬]

'পতিত' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল—'দুদর্শাপ্রাপ্ত', জাতি। 'পাবন' শব্দটির অর্থ—'পাপীদের ত্রাণ কর্তা 'পতিত পাবন হরি'।

ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রাত্য বা পতিত শব্দটিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে 'পতিত' মানুষ সম্পর্কে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। 'পতিত' শব্দটিকে মানব জাতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন মানুষ। কেন 'পতিত' শব্দটি তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

''...এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন তবে এই
ধরণের ধর্মোৎসব যে প্রাক্ বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময়
হইতেই যে সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।
আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা 'পতিত'
তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত

হইয়াছেন এবং সেই জন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন? বোধ হয় তাহাই।''[৫৭]

আমার আলোচনা বা গবেষণা কাজের বিষয়টি মূলত মানুষের সমাজের আত্ম জাগৃতি, আত্ম উন্নতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষার সার্বিক উন্নতির চর্চার জায়গা। কিন্তু উন্নতির কার্যকর্তা হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেন সেই মানুষ জাতিগত পরিচয় নমঃ জাতির মানুষ। একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ থেকে মানুষ জাতিকে বিভাজন করেন বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচনাকার। এ সম্পর্কে ড. নিহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন—

''বৃহদ্ধর্ম পুরাণ একটি উপপুরাণ; ইহার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক; তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে ইহা রচিত হইয়াছিল এমন অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদ দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত এ বিভক্ত ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।''[৫৮]

নমঃশূদ্র জনজাতির নরতাত্ত্বিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন হাটন ও রিজলি। নমঃশূদ্র জনজাতি যে অসংখ্য জনসাধারণ আদি মধ্য ও বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ জাতি। বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে নরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে প্রথমেই নমঃশূদ্রদের কথা বলেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁদের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন জাত সংঘর্ষের কারণে তাদের জাতিগত পরিচয় এতটা নিম্নবর্ণের অধিকারী হয়েছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে নমঃজাতির ইতিহাস রয়েছে। তাদের অতীত ইতিহাস এখনো অনালোকিত রয়েছে। তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। নমঃজাতির অতীত ইতিহাস প্রথমেই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছি আমার গবেষণা কাজের সুবিধার প্রয়োজনে। নমঃজাতির যে নানা সময়ে উত্থান পতন ঘটেছে সেই নমঃজাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হরিচাঁদ ঠাকুর মানব জাতির কল্যাণে উন্নত যে যে কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের ঊষালগ্নে জন্মগ্রহণ করে সেই কর্ম প্রণালীকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব।

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন একাধারে মানুষ ও ভগবানের মূর্তপ্রতীক। তাই তিনি বন্দিত

হয়েছেন ভগবান রূপেও মানুষ রূপে। তার মানুষের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই যে মানুষের জীবনকে উৎকৃষ্ট ধর্মদর্শ ও কর্মাদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা আলোচনার মধ্যেই বোঝা যায়। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল যে বর্ণনা করেছেন যেখান থেকেও বোঝা যায় তিনি অনাদীর আদি ভগবান শ্রীহরিই মানবাকারে ভক্তের সমস্ত দুঃখ মোচনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। বিচরণ পাগলের বর্ণনাটি হল—

''জয় জয় হরিচাঁদ ক্ষীরোদ বিহারী।
অনাদীর আদি প্রভু পূর্ণত্তম হরি।।
হৃদয় আকাশে প্রভু তুমি পূর্ণচাঁদ।
আইলেন খুচাইতে ভক্তের বিষাদ।।
তোমার মহিমা গুণ বলিতে কে পারে।
এমন শক্তি কার আছে ধরা পরে।।
.....
তোমার তুলনা তুমি ওহে দয়াময়।
মহিমা প্রকাশ হেতু হইলে উদয়।।''[৫৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর তৎকালীন মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। ঊনবিংশ শতক একটি বহু আলোচিত সময় কাল। এই সময়ের মানুষকে আত্ম জাগরিত, আত্মচেতনা দান করারও আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মকে অবলম্বন করেন তিনি। মানুষের সকল দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই উনিশ শতকে একক মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রথমেই প্রচলিত সব ধর্মাদর্শের কুসংস্কারকে বাদ দিয়েছেন। একমাত্র 'হরিনাম'কে গ্রহণ করলেন। প্রচলিত সকল ধর্মমতের সারকথাকে সর্বদর্শীর মত গ্রহণ করলেন। একথা তারকচন্দ্র সরকার সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর প্রচলিত সকল ধর্মাচারণের নীতিকে বাদ দিয়েছেন। তৎকালীন মানব সমাজ হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ কর্মাদর্শকে গ্রহণ করার একমাত্র কারণ হল তিনি মানুষের প্রতি সর্বদাই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মানুষের সার্বিক কল্যাণে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।

জনম লাভলা যশোবন্তের গৃহেতে।।''[৬০]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজ জ্ঞানালোকের গভীর প্রজ্ঞার দ্বারা এই সর্ব ধর্মাচারকে লঙঘনের স্পর্ধা দেখালেন ও সর্বভাবেই সাফল্য লাভ করলেন। আর তিনি গ্রামীণ মানুষ হওয়ার জন্যই হত দরিদ্র দুঃখী মানুষগুলির গভীর ধর্মানুভূতিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ফলে মানুষকে শোষণ মুক্ত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সার্বিক ভাবে কাজ করলেন। যেমন— প্রথমেই তিনি মানুষের চরিত্রাদর্শের উপর জোর দিলেন। মানুষকে ধর্মাচারণের জন্য গৃহ ধর্ম ত্যাগ করতে হবে না। গৃহধর্মকে রক্ষা করেই ধর্ম পালন করার নির্দেশ দেন। তিনি ভক্তির দ্বারা মানুষকে সার্বিক মুক্তির পথ দিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যগুলির মধ্যে। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মানুষের মুক্তির চরমাদর্শ ভাবনার প্রতীক হল হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি তীর্থভ্রমণকে বাদ দিতে বললেন মানুষকে। কেননা তীর্থ করলেই মানুষের মনের শান্তির পূর্ণতা পাওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অনেক দিন গৃহে থেকে দূরে অবস্থান করার জন্য পারিবারিক মানুষের শান্তি বিনষ্ট হয়। সাধন ভজনের এতদিনের যে মূল উদ্দেশ্য তা হল মানুষের জীবনে সুখের সন্ধান পাওয়া। মানুষ বাস্তব জীবনে জীবন ধারণের সময় কালের মধ্যে ভগবানের সানিধ্য লাভ করতে না পারলেও পরপার অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবানের সানিধ্য লাভের আশায় ধর্ম কর্ম করেছে মানুষ শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। হরিচাঁদ ঠাকুর তাই ধর্মীয় শাস্ত্রীয় বিধানকে অস্বীকার করলেন মানুষের কল্যাণে। একমাত্র 'হরিনাম' 'হরিবল' মহানামকে গ্রহণ করলেন মানবদেহ ধারী মানবাত্মার কল্যাণে। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম'কেই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে মানুষের চরিত্রকে এই নীতির দ্বারা চালিত করলেন—

''বিরাগ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আচরণ।

রাগ ভক্তি দিয়া মাতাইল সর্ব্বজন।।

গৃহে থাকি প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ।

অনুরাগ বিরাগেতে প্রেম ইষ্ট নিষ্ঠ।।

.....

গৃহ ধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।

বাণপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।

.....

যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।

সত্য বাক্য সম কক্ষ হইতে না পারে।।''[৬১]

মানুষের ধর্ম জীবনের যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তা হল ইন্দ্রিয় বশ। মানুষ সদা সর্বদা 'কামক্রোধ' ইত্যাদি ষড় ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হয়। যার পরিণতি মোটেই সুখ কর হয় না সেই ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারলে মানুষ মহামানব সত্তায় পরিণত হয় সেই মহামানব হতে গেলে কোন তীর্থ দরশন বা কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না সেই কথাই ব্যক্ত করেন হরিচাঁদ ঠাকুর—

''দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।

তীর্থে গেলে ফল প্রাপ্তি না হইবে তার।।

দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।

তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।।

গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।

সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।''[৬২]

গৃহধর্মকে সঠিকভাবে রক্ষা করেই মহাসাধু হওয়া যায়। তার জন্য গৃহধর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির মূল হল মাতা পিতা সেই পিতা মাতার পরিচর্যা ও সন্তানের প্রথম পালনীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। ধর্মাচরণ করতে গেলে কোন শিক্ষকের সন্ধান করে সেই শিক্ষকের দর্শিত পথে মানুষ তার জীবনাদর্শকে পরিচালিত করলে ভগবানের অনুভূতি লাভ করতে পারে। অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনেও লাফল্য লাভ মানুষের একান্ত আবশ্যক হওয়ায় হরিচাঁদ ঠাকুর রূপী মহাশিক্ষক উনিশ শতকের মানুষকে শুধু আত্ম উপলব্ধির পথের সন্ধান দেননি তিনি মানুষের জীবন, মানুষের শরীর, সমাজ জীবনের সার্বিক মঙ্গলময়কর্ম করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর রূপী মহাশিক্ষক কৃষিকাজ করছেন। অর্থাৎ তিনি যে কৃষক পরিবারের

উত্তরসূরী তাঁর যেমন পরিচয় বহন করলেন তেমনি তিনি ছিলেন আত্মিক উন্নতির একনিষ্ঠ কারিগর। তাই তিনি খাদ্য শষ্য ধান চাষচ্ছলে যে কথাগুলি বলছেন সেই কথায় রয়েছে ধর্মাদর্শের গূঢ় অর্থ। মানুষের সত্যিকারের কর্ম চেষ্টার দ্বারা কখনোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে না। তার দ্বারা জগতের মহামূল্যবান কর্ম সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। মানুষগুলির যে সর্ব সৌন্দর্যময় মানুষের মন সেই মানব মন মানুষের হীনমন্যতা বোধের দ্বারা পতিত হয়ে আছে। যা থেকে আত্মশক্তি সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয়েছে। তাই তিনি পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করছেন যেমন তেমনি মানুষের মনের পতিতবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবেই মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—

''যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ।।
এদেশে আবাদী তোরা চিনিলি না কেহ।
মাটি যে অফলা থাকে এ বড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আসা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।
খাটি মাটি হলে ফল না হয় বিফল।
ভক্তি ভরে ডাকে তারে দেই প্রেম ফল।।
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
.....
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।''[৬৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনকে পতিতাবস্থা থেকে মুক্ত করতে প্রথমে 'হরিনাম' বীজ বপণ করেন। পরে সেই চরিত্র মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার রূপ চরিত্রাদর্শকে রোপণ করে মানুষের পতিতাবস্থার সার্বিক মুক্তি দিলেন। তাই তিনি 'পতিত পাবন হেতু হইল অবতার' বন্দিত প্রার্থনার যোগ্য মানুষ। একদিকে অর্থনৈতিক দিককে ফুলে ফলে সাফল্য মণ্ডিত করার বাসনায় কৃষিকাজ করলেন। অপরদিকে আত্মিক শক্তির বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'ঠাকুর' রত্ব প্রকাশ পায় সফলাডাঙা বসবাস কালের সময় থেকেই।

একথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ হল হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল জীবনী সাহিত্য। সেখানের বর্ণনাটি হল—

''সফলানগরী প্রভু যবে কৈল বাস
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরত্ব হইল প্রকাশ।''[৬৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে আগে 'নিষ্কাম বা আত্মসমর্পণ' করেছেন গৃহে থেকেই। তারপর তিনি সকলের মঙ্গল কর্মে সর্বতো ভাবেই আত্ম নিয়োগ করেন। আত্ম স্বার্থকে অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থে আর তিনি কোন কর্ম না করে সমাজ মানুষের কল্যাণ কর্মে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত হলেন। পবিত্র চরিত্র ও নামে রুচি রেখে সামগ্রীক সমাজকে কল্যাণ ভাবনার দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে মানুষকে নবমানবতা বোধের মহাজাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে লাগলেন। কবির বর্ণনায় তাই ব্যক্ত হয়েছে—

''এই মত ঠাকুরালী হইল প্রকাশ।
পরে এসে ওড়াকাঁদি করিলেন বাস।।
.....
ঠাকুরের পুত্র কন্যা কিছু না জন্মিতে।
অলৌকিক লীলা সব করেন ক্রমেতে।।
.....
আত্মস্বার্থ কর্ম্মত্যাগী নিষ্কাম নিয়ম।।
.....
পবিত্র চরিত্র নামে রুচি রাখিলাম।।''[৬৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই সকলের থেকে ব্যক্তিগত চরিত্র গৌরবে ছিল উন্নত ভাবনার অধিকারী। পরে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সেই বোধি বা বুদ্ধি মত্তার পরিচয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রাদর্শ ও কর্মাদর্শের এক মহাসম্মিলনের ফলে তার সমাজের কল্যাণ ভাবনা এক সর্ব্বচ্চো ভাবনায় পরিণত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজে ধর্ম ভাবনার দ্বারাই ভাবিত হন এবং সেই ভাবাদর্শের মানুষগুলির সঙ্গেই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক হরি সংকীর্ত্তন, হরিবাসর। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের মানুষের ক্রমে ক্রমে বিস্তার ঘটে। হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রথম ভগবান রূপের প্রকাশ ঘটে রাউৎখামার গ্রামে। এই গ্রামেই প্রথম হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রভুত্বের প্রকাশ হয়। সেকথা জানা

যায় তারকচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বর্ণনা থেকে—

''আত্মা সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হলেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ।।
শ্রীবংশীবদন আর শ্রীরাম সুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর।।
বালাদের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণ সহ মাতিয়া উঠিল।।
ভক্তগণ সঙ্গে করি হরি প্রেম রসে।
নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে।।
দেশ ভরি শব্দ হল মধুর মধুর।
যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।।''[৬৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মানুষকে জীবনে উন্নত করার জন্য ভাবনা কার্যাবলীর পরিচয় আজও পাওয়া যায়। তাঁর কাজে সত্যিই সেকালে তো বটেই একালেও আশ্চর্য হতে হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের মনের সর্বাঙ্গীন মোহ মুক্তির জন্য নামের উপর গুরুত্ব দেন। আর মানুষের জীবন যে মহামূল্যবান সেই মানুষের শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর সুস্বাস্থের জন্য তিনি নিজেই চিকিৎসকের কাজ শুরু করেন। সত্যিই তিনি মানুষের ভাবনার জন্য ভগবান ছাড়া আর কোন উপাধীতে ভূষিত হলে সত্যিই তার পূর্ণতা হত না। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে হরিভক্তের তথা সামগ্রিক ভাবে বলা যায় ঈশ্বর সন্ধানী ভক্ত মানুষের যেমন তিনি ভগবান তেমনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ এবং অর্থনৈতিক ভাবে যারা দুঃখের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন তাদের জন্যও তিনি ছিলেন সমান ভাবেই ভগবান। তিনি অসুস্থ মানুষগুলির একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাদের যে শুধু তিনি শারীরিক ব্যধিকে সারিয়ে তুলেই শান্ত হতেন তা নয় তিনি তাদের ভক্তি জ্ঞানের আলোক দান করে সমাজের পূজ্য মানুষের পরিণত হওয়ার সমস্ত কর্মগুলিই করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর এই মানুষগুলির প্রেমভক্তিতেই ছিলেন পূর্ণ। তাদের জীবনের সেরা ভক্তিই অর্পণ করতেন হরিতে বা হরিচাঁদ ঠাকুরকে। কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজ মানুষের চিকিৎসা করতেন তার পরিচয় পাই আমরা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের মধ্যে। এছাড়া একথা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হবে না যে হরিচাঁদ ঠাকুর পরবর্তীও তৎকালীন

সময়ে অনেক সাধুগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের নামের দ্বারা এবং কোন পথ্য দানের দ্বারা মানুষের অনেক শারীরিক ব্যধির থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। আজকের বিজ্ঞানের দ্বারা ঔষধ চিকিৎসার উন্নতির অনেক আগেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও পার্ষদগণও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অনেক ভক্ত সাধুগণ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে মানুষকে ব্যধিমুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দান করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের যে চিকিৎসা পদ্ধতির পরিচয় পাই তা হল—

‘‘রোগযুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।
কীর্ত্তনের ধূলা অঙ্গে মাখিবারে কয়।।
অমনি সারিয়া ব্যধি করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বা লোটায় ধরে প্রভুর চরণ।।
কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।
ব্যধি মুক্তি হোক মোর পূর্ণ হোক আশা।।
হরি লুঠ দিব এনে শ্রীহরির স্থানে।
কেহ কেহ মুদ্রাদিব মনে মনে মানে।।
কীর্ত্তনে আসিয়া কেহ গায় মাখে ধূলি।
রোগ মুক্ত হয়ে নাচে দুই বাহু তুলি।।
.....
কখন কখন প্রভু নিশ্চিন্ত থাকয়।
কোন ব্যধিযুক্ত লোক এমন সময়।।
রোগীরা মানসা সব করিত হরিষে।
আরোগ্য হইলে ব্যধি দাস হব এসে।।
কেহ বা কহিত দাস হইনু এখনে।
মনঃপ্রাণ দেহ সপিলাম শ্রীচরণে।।
দেহের এ রোগ মম হউক আরোগ্য।
অর্থ কিছু তাম্র মুদ্রা দিয়া যাব শিঘ্র
.....
কেহ বা যাইত মনে মানসা করিয়া।

আরোগ্য হইলে ব্যধি দিতেন আনিয়া।।

প্রভুর মুখের বাক্যে রোগ মুক্ত হয়।

এই মত রোগী কত আসে আর যায়।।

পাঁচ সাত গ্রামে ক্রমে শব্দ হল ভারি।

কত লোক আসিত দেখিব বলে হরি।।''[৬৭]

এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ সংসার জীবনের মধ্যেই সুখের সন্ধান করেন। সেই সংসার জীবনের মধ্যেই সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা করান হরিচাঁদ ঠাকুর। রোগের আরোগ্য করেন নিজে হরিচাঁদ ঠাকুর কখনো রোগের ব্যবস্থা দানের মাধ্যমে আবার কখনো নিজেই ব্যবস্থা করে সুস্থ করেন। আবার ঠাকুর অনেক সাধকগণকে রোগারোগ্যের চিকিৎসা করার জন্য বলে দিতেন। কারণ অনেক দূর থেকে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে পৌঁছাতে সময়ের দরকার আবার কষ্টের ও কারণ তাই অনেক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয় সাধুগণকে বলতেন আমাকে চিন্তার মধ্যেই তুই রোগের আরোগ্যের ব্যবস্থা করে সুস্থ করিস। এভাবেও অনেক মানুষ চিকিৎসায় সুস্থ হলে পরে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্ম সমর্পণ করত। রোগের ব্যবস্থা দিতেন হরিচাঁদ ঠাকুর যেভাবে তাকে তারকচন্দ্র সরকার নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

''লোক আসে প্রভু স্থানে হয়ে রোগ যুক্ত।

সংকীর্ত্তনে গড়ি দিলে রোগ হয় মুক্ত।।

রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে।

রোগ মুক্ত হত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে।।

প্রভু বলিতেন যদি রোগ মুক্তি চাও।

যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া যাও।।

তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ কীর্ত্তনের খোলা।

জ্বর হলে পথ্য দেন তেতুলের গোলা।।

বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।

তেতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।

মহারোগে অঙ্গে মাখো গোময় গোমূত্র।।

কেহ বা আরোগ্য পায় প্রভু আজ্ঞা মাত্র।।

রোগ জানাইয়া যায় মানসা করিয়ে।

মানসিক টাকা দেয় রোগ মুক্ত হয়ে।।

মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।

একান্ত মনেতে যার যেই রূপ ভাক্তি।।''[৬৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে ড. সুকুমার হালদার 'হরিচাঁদ ঠাকুরের বিজ্ঞান চেতনা' নামক প্রবন্ধে ঠাকুরের চিকিৎসার পথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

''রোগ মুক্তির জন্য ঠাকুর বলেছেন—

''... যদি রোগ মুক্তি চাও।

যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া যাও।''

ঠাকুরের এই মহান বাণী রোগ আরোগ্য জন্য, যা খুঁজে পাওয়া যায় একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। যে চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ জগতে হোমিওপ্যাথি নামে সুপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই হোমিও প্যাথির স্রষ্টা মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলেছেন কোনও রোগীর অস্বাভাবিক লক্ষণ সমূহ ও অনুভূতি সমূহের সদৃশ্য লক্ষণ সমূহ উৎপাদন করতে সক্ষম এমন কোন ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ্য চিকিৎসা বিধান বলা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতি 'similia similibus curentur' এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তিই ঔষধের রোগ আরোগ্যকারী শক্তি। একটি ঔষধ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করলে যে সমস্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ ও অনুভূতি সমূহ প্রকাশ করতে পারে, কোন রোগীর মধ্যে যে সমস্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ ও অনুভূতি সমূহের সদৃশ প্রকাশ থাকলে সেই ঔষধটিই আরোগ্য করতে সক্ষম হয়। এক কথায় বলা যায় যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই রোগ আরোগ্য করতে পারে। যেমন বলা হয়

বিষে বিষ ক্ষয়।স্রষ্টা যেমনি সৃষ্টি করতে পারে তেমনি যে ধ্বংস করতেও পারে।

জ্বরে তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন তেঁতুল গুলে খেতে। তেঁতুলের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে টক, তার ক্রিয়া অ্যাসিডিক। সে যখন পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে প্রতি নিয়ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরিত হচ্ছে। তার সঙ্গে তেঁতুল গোলার এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে ফলে শরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত তাপমাত্রা কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। তখন জ্বর আরোগ্য হচ্ছে এবং রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবেই ঠাকুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে জ্বর আরোগ্যের জন্য তেঁতুল গোলার কথা বলেছিলেন। .....

বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।

তেঁতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।

এখানেও ঠাকুরের বিধানে দেখা যায় যে অজীর্ণ জনিত পেটে ব্যথা, বমি, অম্লশূল এবং পিত্ত শূলে তিনি পিতলের পাত্রে তেঁতুল গুলে রোগীকে খাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় পিতল পাত্রের সংস্পর্শে তেঁতুলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়া ঘটার পর উক্ত দ্রবণ যখন পাকস্থলিতে পৌঁছে যায় তখন সেখানে পাকস্থলি নিঃসৃত অ্যাসিডের সঙ্গে পুনরায় বিক্রিয়া ঘটে যা পাকাশয়ের পেশী এবং অন্ত্রের পেশীতে উৎপন্ন স্পাজম বা আক্ষেপ বা খিচুনী নিবারণ করতে সক্ষম হয়। আক্ষেপের ফলে খাদ্যবস্তু ঊর্ধ্বগামী হওয়াকে বন্ধ করে পেশীর আক্ষেপ বন্ধ হয়; পিত্তক্ষরণ স্বাভাবিক হয় ফলে পিত্তশূল বন্ধ হয়। বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে রোগী আরোগ্য হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়।

ঠাকুর বলেছেন—

> ''মহারোগে অঙ্গে মাখো গোময় গোমূত্র।' এই মহারোগ বলতে বোঝায় উদরী, অশ্মরী, জগদোষ, উন্মাদ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধূমেহ এবং ভগন্দর এই আট রকম রোগকে বলা হয় মহারোগ। তাছাড়া কুষ্ঠ ব্যধিকেও মহারোগ বলা হয়। মহানরোগ অর্থাৎ কঠিন রোগ যা সহজে আরোগ্য লাভ করে না। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে বর্তমান সময়ের মত চিকিৎসা ব্যবস্থা এত উন্নত মানের ছিল না। সঠিক চিকিৎসা হত না যার ফলে মানুষ অকালে প্রাণ বিসর্জন দিত। সেই দুঃসময়ে দুরারোগ্য ব্যধির জন্য তিনি গরুর বর্জ পদার্থ অর্থাৎ মল এবং মূত্র যাকে বলা হয় গোময় বা গোবর এবং মূত্র বা চোনা ব্যাধি মুক্ত হতে অঙ্গে মাখতে বলতেন। এই গোময় এবং গোমূত্রের মধ্যে মহান আরোগ্যকারী শক্তি লুকিয়ে আছে যা মহাব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেই আরোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাঁর ছিল তাই তিনি মহারোগ যুক্ত মানুষকে গোময় এবং গোমূত্র শরীরে লাগাতে নির্দেশ দিতেন।''[৬৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই ছিলেন আত্মানুভূতিও আত্মদর্শনকারী এক সর্বদর্শী মানুষ। তিনি মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণের জন্য হরিনাম মহানামকেই গ্রহণ করলেন। সেই আত্মানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কখনো মানুষকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত করা সম্ভব হত না। তিনি জন্মসূত্রেই ধর্মভাবনার অধিকারী ছিলেন এবং যে সমাজ পরিবেশের মধ্যে তার সামাজিক জীবন অতিবাহিত হয়েছিল সেই সমাজ ছিল একদিকে গ্রামীণ সমাজ তারপর সেই সমাজে ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষের বাস। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের একান্ত আপন হয়েই নিত্য সঙ্গী হয় এই সমাজের মানুষ এবং তাদের ধর্ম ভাবনা। আর তিনিও ছিলেন প্রথম থেকেই সত্যনিষ্ঠ মানুষ। তাই সহজেই তিনি সকলের কাছে প্রিয় মানুষে পরিণত হতে পেরেছিলেন। আর তিনিও ছিলেন গভীর আত্মানুভূতিশীল মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কাহিনি বা তার জীবনী গ্রন্থ থেকেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। হরিচাঁদ ঠাকুর যখন সমাজ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে

মিশে গেছেন তখন তিনি একদিন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে এই সমাজ মানুষের কল্যাণ করবেন সে কথা ভেবেছেন। তিনি একদিন জয়নগর গ্রামে যাত্রা করার অভিপ্রায়ে চলেন কিন্তু তিনি মাঠের মধ্যে একটি বকুল গাছের নীচে বসেন চিন্তার মাঝে ডুবে ও আত্মানুভূতি লাভ করেন সেই আত্মানুভূতিগুলি মানুষের কল্যাণের চির কল্যাণময় বার্তা বহন করেছে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''একদিন চলেন প্রভু জয়নগরে।।
আড়োকান্দী মাঠ মধ্যে তুলি উচ্চে শির।
বকুলের গাছ এক দাঁড়াইয়া স্থির।।
সন্ধ্যার অগ্রেতে প্রভু কি জানি কি ভাবি।
বসিলেন বৃক্ষমূলে চিন্তামাঝে ডুবি।।
অনন্ত আপন মাঝে প্রভু ডুবে রয়।
আপন স্বরূপ প্রভু দেখিবারে পায়।।
মহান পুরুষ রূপে আপনার আত্মা।
প্রভুর সম্মুখে আসি কহিলেন বার্তা।।
''নামধারী দেহ রূপে তুমি হরিচাঁদ।
জীব-শিক্ষা-লাগি নরজগতের নাথ।।
তুমি-স্থূল আমি-সূক্ষ্ম উভয়ে অভিন্ন।
দেহ আত্মা মোরা দোঁহে মূলে নহি ভিন্ন।।
গৃহধর্মে সু-আদর্শ সব দেয়া হল।
দেহ গৃহ শুচি কার্য্য জীবে কি বুঝিল?
দেহমন নহে শুচি গৃহধর্ম্ম করে।
ছিদ্রযুক্ত তরী সম ডুবে যে সাগরে।।
দেহমন সর্বক্ষণ রাখিতে পবিত্র।
শিখাইতে হবে জীবে সেই মূল সূত্র।।
তুলিয়া নামের ঢেউ প্রেম প্লাবনেতে।

ধুয়ে মুছে নিব সব নাম প্রবাহেতে।।

.....

হরি প্রেম প্লাবনেতে জীব মুক্তি পাবে।।

দেহমন শুদ্ধ হলে স্থির হবে আত্মা।

তখন শিখাতে হবে গৃহধর্ম কথা।।

.....

প্রেম প্লাবনেতে মাটি সরস হইবে।

সোনার ফসল তাহে অবাদে ফলিবে।।''

এই ভাবে নিশি ভোর ভাবে অচৈতন্য।

আত্মস্থ হৈল প্রভু জীব মুক্তি জন্য।।''[৭০]

আত্মদর্শনে তিনি যেন একটি চলার ছন্দ পেলেন মানুষের উন্নত জীবন গড়ার ভিত্তি স্বরূপ। এখানে আর একটি কথাও ব্যক্ত হয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শনের মধ্যে। দেহ ও আত্মা একই মানুষের দেহের চেতনবস্তু। দুজনের কোন ভেদ নেই। দেহকেই সর্বক্ষণ শুদ্ধ পবিত্র রাখার মধ্যেই সেই চেতনবস্তু সত্তার বিকাশ ঘটে। আর দেহ ধারী মানুষই শরীরে ভগবানের সাধনা দ্বারা নিজের আত্মদর্শন করেই ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন। আর সেই আত্মদর্শনকারী মানুষই ভগবান সম্পর্কে সাধনার দ্বারা নিজের ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করেন এ ও সত্য। হরিচাঁদ ঠাকুর কোন একটি মানুষের জীবনের আত্মদর্শন করে ব্যক্তি জীবনের সৌন্দর্য বিকাশের সহায়ক হননি। তিনি সমগ্র মানুষের আত্মানুভূতি বা আত্মদর্শন কামনায় তিনি সমবেতভাবে হরিনাম করার নির্দেশ দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের এক জীবনেই পূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য মানুষকে যেমন ধর্মপথ দেখান তেমনি গুরুত্ব দেন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনেও এবং সর্বপরি বলা যায় সমাজ গঠনে। তিনি সার্বিক ভূমিকা পালন করেছেন।

'মতুয়া' কথাটি হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে প্রচলিত। হরিচাঁদ ঠাকুর হলেন 'মতুয়া' ধর্মের প্রবর্তক। এভাবেই সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে 'মতুয়া' ধর্মের। 'মতুয়া' ধর্মের মূল আকর গ্রন্থগুলির কোথাও একথা ব্যক্ত হয় হয়নি যে 'মতুয়া' নামকরণ হরিচাঁদ ঠাকুর করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তার সমাজের মানুষদের হরিনামের উপর জোর দিতে বলতেন। এবং

নামসংকীর্ত্তন করতেন ভক্তগণ সঙ্গে করে একথা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রেই বর্ণিত হয়েছে। হরিনামের গানে যে ভক্তগণ বিভোর থাকতেন সে পরিচয় আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভগবান স্বরূপের বিকাশের সময় থেকেই পাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসরণকারী ভক্ত মানুষদের একটি উপাধি বা খ্যাতি হল 'মতো' বা মতুয়া। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত মানুষদের নিয়ে মত্ত হয়ে হরিনাম করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদেরই উপাধি হল 'মতো' বা 'মতুয়া'। এই 'মতো' বা 'মতুয়া' উপাধির একটি সমাজ ইতিহাস আছে। সেই সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রটি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের অধিক হরিভক্তির পরিণতিও বলা যায়। একথা সত্য যে ভক্তির জগতে ভক্তির প্রাবল্য একটু গভীর হয় এটাই স্বাভাবিক। যে ভাবালুতার প্রকাশ ঘটে ধর্ম সভায় তা বাস্তব সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রযোজ্য হয় না। একথা ভক্তিভাবের আবেশের সময় জ্ঞান থাকে না তখন ভক্তিই একমাত্র স্মরণ্য। আর ভক্তি এমন একটি মানসিক প্রবণতা যা মানুষের শ্রেষ্ঠ বস্তু হলেও সময়ভেদে তার তারতম্য ঘটে যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' উপাধিটিও সেই ভক্তদের ভক্তি ভাবনায় প্রাবল্য থাকার সময়ের কার্যাবলীর পরিচয় বহন করছে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকে 'ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণ' অংশ থেকে আমরা সেই কথা জানতে পারি। আলোচনার পরিস্ফুটনের জন্য 'ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতি বিবরণে'র সমগ্র অংশটিকেই তুলে ধরলাম—

''ওড়াকাঁদি রাউৎখামার মল্লকাঁদি।
ভ্রমণ করেন হরিচাঁদ গুণবিধি।।
সঙ্গে সংকীর্ত্তন গান হতেছে স্বচ্ছন্দে।।
নিজ গ্রাম শ্রীধামের পশ্চিম অংশেতে।
উপনীত হইলেন দাসের বাটীতে।।
একে একে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল।
সভা করি ভক্তগণ সকলে বসিল।।
হরিকথা কৃষ্ণকথা নাম পদ গায়।
মধ্যবর্ত্তী মহাপ্রভু বসিয়া সভায়।।
একে একে গ্রামের অনেক লোক আসি।
সভা করি বসিলেন যত গ্রামবাসী।।

পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভু পশ্চিমাভি মুখে।

গ্রামী লোক দক্ষিণে প্রভুর বাম দিকে।।

পশ্চিম দিকেতে বসি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।

ভক্তগণ প্রেমাবেশে করে ঢলাঢলি।।

কিছু দূর উত্তরে বসিয়া রামাগণ।

হুলুধ্বনি দিতেছে শুনিয়া সংকীর্ত্তন।।

হেন কালে তিনজন ব্রাহ্মণ আসিল।

সভা মধ্যে আসিয়া তাহারা দাণ্ডাইল।।

সবে বলে বসুন বিছানা আছে অই।

তারা বলে হরিচাঁদ প্রভু তিনি কই।।

জগতের ঠাকুর বসিয়া তিনি অই।।

একদৃষ্টে তাহারা প্রভুর পানে চায়।

তপস্বী বৈরাগী উঠে হেন কালে কয়।।

দেখিলি ঠাকুর ওরে ঠাকুর তনয়।

ঠাকুর দেখিলে পরে প্রণামিতে হয়।।

তিন বিপ্র একজন মধ্যম বয়স।

আর দুটি বয়সেতে পৌগণ্ডের শেষ।।

এই দুই ব্রাহ্মণ তাহার একজন।

ঠাকুরে প্রণাম করে শুনি সে বচন।।

একটি প্রণামে দাড়াইয়া আরজন।

কৈশোর প্রথমাবস্থা সেই সে ব্রাহ্মণ।।

চাহিয়া ঠাকুর পানে নেত্র তার স্থির।

সেই ব্রাহ্মণের ছিল অসুস্থ শরীর।।

তপস্বী বৈরাগী তবে উঠে সভা হতে।

ব্যধিযুক্ত ব্রাহ্মণেরে লাগিল কহিতে।।

ঠাকুর দেখিতে এলে প্রণমিতে হয়।

দেখিলেত ঐবিপ্র প্রণমিল পায়।।

এখন পর্য্যন্ত কেন দাঁড়াইয়া রও।

ঠাকুর দেখিয়া কেন প্রণামনা হও।।

এতেক বলিয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরি।

মত্ত মাতালের প্রায় বলে হরি হরি।।

গ্রীবাধরি চাপমারী ভূমিতে ফেলায়।

বলে বাবা দেরে সেবা ঠাকুরের পায়।।

চাপ পেয়ে সেই দ্বিজ প্রণাম করিল।

মঙ্গল দাড়ায়ে বলে হরি হরি বল।।

হরিচাঁদ পদ হতে পদরজঃ এনে।

ব্রাহ্মণের মস্তকেতে দেয় টেনে টেনে।।

এইমত তিনবার ধূলি দিল গায়।

অঙ্গেতে যে ব্যাধি ছিল তাহা সেরে যায়।।

ব্যাধিমুক্ত হয়ে দ্বিজ সভাজনে কয়।

অবতীর্ণ সামান্য মানুষ ইনি নয়।।

ক্ষণেক থাকিয়া তবে দ্বিজেরা চলিল।

সভাসদ বিপ্র যত রাগান্বিত হল।।

গ্রামবাসী বহিরঙ্গ লোক যত ছিল।

তাহাদের অতিশয় রাগ উপজিল।।

ব্রাহ্মণে লইয়া করে বিরোধাচরণ।

ইহাদিগে কৃষ্ণ ভক্ত বলে কোন জন।।

কি পেয়েছে কি হয়েছে ঠাকুরালী করে।

ঠাকুর বলয় যশোবন্তের কুমারে।।

অবৈধ সকল কাজ বিধি নাহি মানে।

সমাজের বাধ্য নয় এই কয় জনে।।

শুন সবে প্রতিজ্ঞা করিনু আজ হতে।

ইহাদের সঙ্গে না করিব সামাজিতে।।

নাহি মানে দেব দ্বিজ আলাহিদা পথ।

ইহারা হয়েছে এক হরি বলা মত।।

আহারাদি না করিব ইহাদের সঙ্গ।

অদ্য হতে গ্রাম ভাব করিলাম ভঙ্গ।।

সে হইতে গ্রামবাসী হল ভিন্নদল।

সে অবধি হরিবোলা পৃথক সকল।।

বিবাদীরা বলে ওরা হয়েছে পাগল।

কাণ্ডকাণ্ড জ্ঞান নাহি বলে হরি বলো।।

হরি বোলা দেখে উপহাস করে কত।

সবে বলে ও বেটারা হরি বোলা মতো।।

কেহ বলে জাতি নাশা সকল মতুয়া।

দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া।

অন্য কেহ যদি হয় হরিনামে রত।

সবে করে উপহাস অই বেটা মতো।।

অন্য অন্য গ্রাম আড়োকাঁদি ওড়া কাঁদি।

সে হইতে হয়ে গেল মতুয়া উপাধি।।

হরিধ্যান হরিজ্ঞান হরিনাম সার।

প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার।।

তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।

ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।

মতুয়া উপাধি খ্যাতি জগতের মাঝ।

রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।''[৭১]

এই ভক্তিভাব প্রকাশের ধরণকে কবির ভাষায় বহিরঙ্গ ভক্তগণ উপহাস রূপ ব্যঙ্গ করে 'মতুয়া' বলে অভিহিত করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শুধুমাত্র সেই 'মতুয়া বা মতো' পরিহাস কথাটিকে সমর্থন করেছেন নির্বিকার চিত্তে। সেই থেকেই 'মতুয়া' একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের

জন্ম ঘটল। আসলে হরিচাঁদ ঠাকুর সনাতন ধর্ম যা শ্বাশতকালের মানুষের ধর্ম সেই মানুষের ধর্মকেই জাগরণ ঘটালেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের আত্মশিক্ষার জন্য হরিনাম সংকীর্ত্তন করার নির্দেশ দেন। মত্ত হয়ে হরিনাম কারীদের উপহাস স্বরূপ 'মতো' বা 'মতুয়া' হিসাবে পরিচয় হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমাবস্থায় যে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন 'মতুয়া' উপাধীতেই খ্যাত হবে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ জগত সভায় আজ সেই বাণী সার্থক রূপ লাভ করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' উপাধিটি শুনে বলেছেন—

''তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।
ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।''[৭৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সময়ের অনেক ভক্ত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলা মেশায় হরিচাঁদ ঠাকুরের একটি আদর্শগত মিল ছিল অনেক মানুষের সঙ্গে। ফলে গ্রামবাসীগণের থেকে ভিন্ন দল হয়ে চলার মতো ভক্ত সমাজকে তিনি গঠন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে যারা কীর্ত্তন করত এবং হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে যারা আত্ম সমর্পণ করে হরি অবতার বলে বিশ্বাস করতেনও হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে মত্ত হয়ে হরিনাম করত তাদের দলের নামকরণ হয় 'মতো' বা 'মতুয়া'। হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সময় বলেন ঠিক আছে 'ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান'। এভাবে হরি ভক্তের অপমানে স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুর নব ভাবে ধর্মজাগরণের জন্য মানুষের আত্মসংস্কার, আত্মচৈতন্য, আত্মদর্শন করার সকল কাজই করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের নব মানবতাবোধের জন্য ধর্ম বিধি সমাজ বিধি ও শিক্ষার নবরূপ সৃষ্টির জন্যই যেন জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয়েছে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য কবিরস রাজ তারকচন্দ্র সরকার বার বার সেকথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' গ্রন্থে কবি বলছেন—

''মানব কুলে আসিয়ে যশোবন্ত সূত হয়ে
জন্ম নিল সফলা নগরী।
প্রচারিল গঢ়াগম্য, সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম,
জানাইল এজগত ভরি।।''[৭৩]

তিনি যে ধর্মাদর্শ প্রচার করেন তাকে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন ধর্ম ছিল পঞ্চ ভৌতিক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনাতন ধর্মকে আবার ভূতের ধর্মও বলা

হয়। কারণ এই ধর্ম মূলত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ছিল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল। পঞ্চভূতের এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর বিশেষ জ্ঞানার্জনের দ্বারা সনাতনী আদিপুরাণকে সংস্কারের মাধ্যমে যাঁরা আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক করে সনাতন ধর্মদর্শকে সমৃদ্ধ আকারে তুলে ধরতেন তাঁদের বলা হত বুদ্ধ বা জ্ঞানী। কিন্তু ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৈদিক আর্য আগমণের পর বৈদিক বর্ণধর্মের প্রবর্তনের সাথে সাথেই ধীরে ধীরে পতন ঘটতে থাকে সনাতনী এই ভূতের ধর্ম দর্শনের।

হারিয়ে যায় না চির পুরাতন কখনই হরিচাঁদ ঠাকুরে কর্মে এই মহাসত্য প্রকাশিত হয় সনাতনী ভূতের ধর্মদর্শনের তিনি পুনর্জাগরণ ঘটান। সনাতন ধর্মের একবার পুনর্জাগরণ ঘটান বুদ্ধ গৌতম। কারণ সনাতন ধর্ম সংস্কারকদের বলা হত বুদ্ধ। তাই বৌদ্ধ ধর্ম আসলে সনাতন ভূতের ধর্মেরই একটি সংস্কৃত রূপ। আবার এই পঞ্চভৌতিক ভূতের ধর্মের বা সনাতন ধর্মের পুনরায় আত্মজাগরণ ঘটান হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকের ধর্ম সংস্কারকগণের সমসাময়িক হয়েই তিনিও সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটান সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। আর তিনি যে সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মই প্রচার করেন তার প্রকাশ রয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। আর একথাও জোর দিয়ে বলা যায় তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে নবভাবে সংস্কার করেননি তিনি সনাতনী সেই ভূতের ধর্মেরই নবজাগরণ ঘটান একথা 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' থেকেই বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের মূল কথাতেই সেই সনাতন আদর্শটি যেমন ধরা পড়ে তেমনি তার নব ভাবনাটিও স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে—

> ''সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙিঘ এবে করিলেন স্থূল।
> শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
> জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
> ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।
> এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
> জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।''[৭৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর যে সনাতন ধর্মকেই নব ভাবে জাগ্রত করলেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে তা উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্ম ভাবনায় একথা ব্যক্ত হয়

যে মানুষের কল্যাণে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নবভাবে মানুষের ধর্ম ও কর্ম ভাবনাকে বাস্তব জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হলেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুর সারা জীবনের কর্ম সাধনায় যতটা পারলেন মানুষের আত্ম উন্নতিতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকে বিভিন্ন দেশে দেশে প্রচার করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের একান্ত আপন মানুষেরা যারা হরি অবতার বলে ভক্তিতে বাধ্য ছিলেন তারাই। হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক একদল আত্মনিষ্ঠ ভক্তের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর কাছে। তারাই হরিভক্তির নব আদর্শকে বহন করেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। হরিচাঁদ ঠাকুরের পর তার সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে বিভিন্ন গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে উন্নতির পথে অগ্রসর করেন। আর এই সময়ও ভক্ত মানুষের বৃদ্ধি ঘটছিল আরও গভীর ভাবে। ফলে সমাজের প্রায় সর্ব স্তরেই মতুয়া ধর্মের প্রভাব পড়ছিল। আমার পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বিবরণ সহ আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভারত সংস্কৃতি, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরর দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, আষাঢ় ১৪০০, পৃ. ১০।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৬. সুর, ড. অতুল—ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৭০০০০৬, কার্ত্তিক, ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৯. সেন, সুকুমার—ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং,

বঙ্কিম চ্যাটাজি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, বৈশাখ, ১৪১১, এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

১৪. সরকার কবিরসরাজ তারকচন্দ্র শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০।

১৫. বৈরাগী, মনিমোহন: অনালোকিত ইতিহাসের উত্তান-পতনে কাশ্যপ মুণির বংশধর 'নমঃজাতি', প্রথম প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ৮ই অক্টোবর বুধবার ২০১৪, পৃ. ৯-১০।

১৬. সুর, ড. অতুল—ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য লোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৭০০০০৬, কার্ত্তিক ১৪১৫, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১৯৪।

১৭. রায়, নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ২৭।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

২১. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণা পাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২৪. বৈরাগী, মনিমোহন—অনালোকিত অতীত ইতিহাসে ভারতীয় মূল নিবাসীরা ও তাদের ধর্মভাবনা, তৃতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩ মার্চ, ২০১৪, পৃ. ১১১-১১২ ।

২৫. সেন, অভিজিৎ—রুহ চণ্ডালের হাড় উপন্যাস।

২৬. বসু, স্বপন—বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ,

পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০০, পৃ. ৯৯।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নতুন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২-২০১৩, পৃ. ১২৫।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৪১. বসু, স্বপন—বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তকবিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৯৯।

৪২. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৯।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৫৭. রায়, ড. নীহাররঞ্জন—বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৫৯. পাগল, বিচরণ—শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ১।

৬০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

৬৯. বৃন্দাবণে পূর্ণব্রহ্ম—শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৬৯-৭০।

৭০. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র—শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩-৭৪।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।